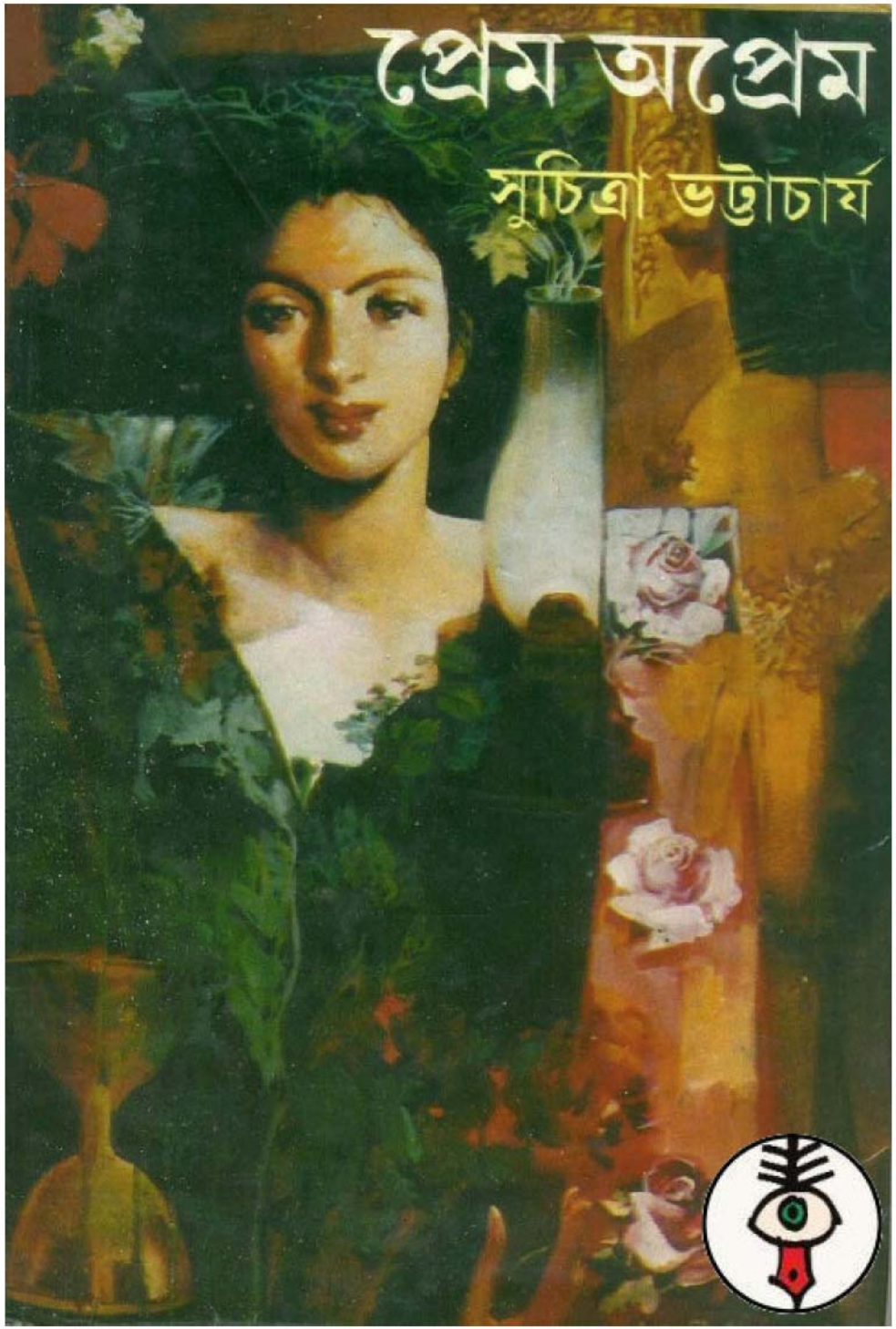

প্রেম অপ্রেম
সুচিত্রা ভট্টাচার্য

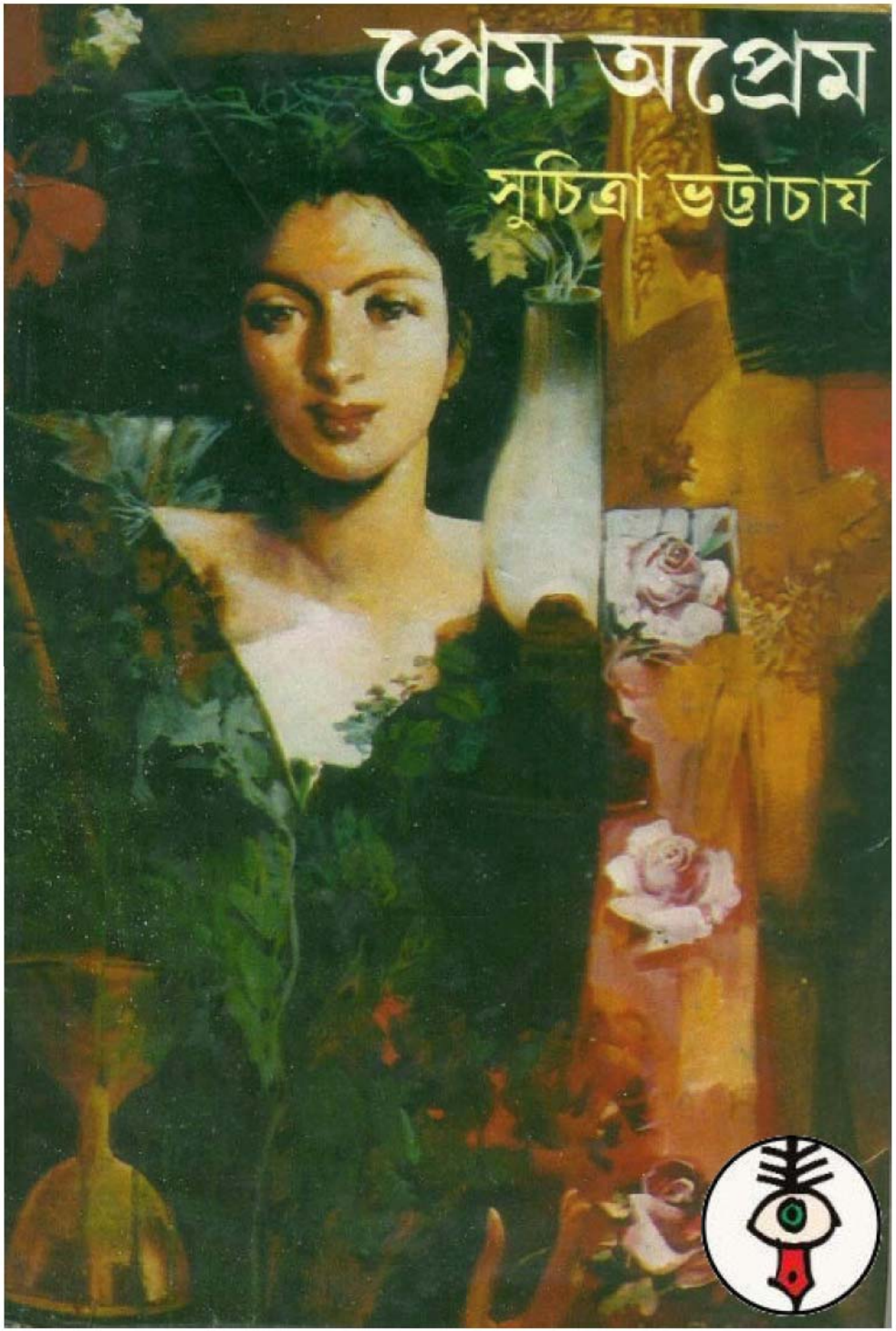

প্রেম অপ্রেম
সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সবিনয় নিবেদন

এই সময়ের যে-ক'জন লেখিকা অসামান্য সাহিত্য সৃষ্টির গুণে বাংলা সাহিত্যে নিজের জায়গা পাকা করে নিয়েছেন, সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁদের অন্যতম। তাঁর দেখার চোখ অসাধারণ, ভাষা ঋজু, আন্তরিক, প্রসাদগুণ সম্পন্ন, চরিত্রচিত্রণ অনায়াস ও বিশ্বস্ত। পটভূমি ও পরিবেশ রচনাতেও তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত।

'প্রেম অপ্রেম' সুচিত্রা ভট্টাচার্যের দুটি ছোট উপন্যাসের যুগলবন্দি। এই দুটি উপন্যাস হল 'হৃদয় অতল' এবং 'হঠাৎ অরণ্যে'। এই প্রখ্যাত লেখিকার অন্যান্য গল্প-উপন্যাসের মতো এই বইটিও, আশা করা যায়, পাঠকচিত্ত জয় করবে।

প্রকাশক

হৃদয় অতল

আমার বই . কম
amarboi.com

সাহিত্যম্ প্রকাশিত
এই লেখিকার অন্যান্য বই

❖

এখন হৃদয়

❖

একা জীবন

আমার বই.কম
amarboi.com

এমন একটা সংবাদের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না সুদীপা। লাইন কেটে যাওয়ার পরও টেলিফোন কানে চেপে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল। কুঁক কুঁক শব্দ বাজছে টেলিফোনে। একটানা। গোঙানির মতো।

অবশ করে দিচ্ছে মস্তিষ্ক।

বাণীব্রত কাজ থামিয়ে সুদীপাকে লক্ষ করছিল। সিনিয়ার টাইপিস্টের মুখচোখ দেখে তার ভুরুতে ভাঁজ, কী হল ম্যাডাম? এনি ব্যাড নিউজ?

সুদীপা ঘাড় নাড়ল। নাকি নড়ল ঘাড়? রিসিভার নামিয়ে সামলাচ্ছে নিজেকে।

প্রাণপণে স্বর স্বাভাবিক রেখে বলল, আমার হাজব্যান্ডের হার্ট অ্যাটাক...অফিসে।

—সর্বনাশ! বাণীব্রত প্রায় আঁতকে উঠেছে, মিস্টার সিন্‌হার অফিসের ফোন ছিল?

—নাহ্। নার্সিংহোম। ওর অফিসের কাছেই গ্রিনল্যান্ডস, ওখানেই নিয়ে গেছে কলিগরা।

আমাকে এক্ষুনি চলে যেতে বলল।

—অবশ্যই। অবশ্যই। বাণীব্রত শশব্যস্ত, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ুন। গ্রিনল্যান্ডস মানে তো সেই সল্টলেক....ট্যাক্সি নিয়ে নিন।

সেকশান অফিসারের টেবিল থেকে সরে আসতে গিয়েও সুদীপা ফিরল আবার। অস্ফুটে বলল,—একটা ফোন করতে হবে যে!

—শিওর। করুন।

বাবানের নম্বরটা যেন কত? মগজে গাঁথাই থাকে, তবু এই মুহূর্তে স্মরণ করতে সময় লাগল কয়েক সেকেন্ড।

অতগুলো সংখ্যা, গুলিয়ে যাচ্ছে। নাইন এইট থ্রি ওয়ান...তারপর কী? তারপর কী?

ভেবে ভেবে ঠিক নম্বরই টিপেছে। বাজছে মোবাইল। রিং হতে না হতেই ওপারে বাবানের গলা, বলছি।

—বাবান, একটা খুব খারাপ খবর আছে রে।

—কে? মা? ...একটু জোরে বলো, শোনা যাচ্ছে না।

উদ্দাম বাজনার শব্দ ও প্রান্তে। গিটার ড্রাম ম্যারাকাস আর পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়নের সমবেত ঝংকার। রিহার্সাল চলছে বাবানদের।

সুদীপা স্বর চড়াল সামান্য। কেটে কেটে বলল, তোর বাবার হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে গেছে। দুপুরে অফিসে টয়লেট থেকে বেরিয়ে নিজের রুমে যাচ্ছিল, হঠাৎ চেস্টপেন, দরদর ঘাম, অজ্ঞান মতোও নাকি হয়ে গিয়েছিল। ...শুনতে পাচ্ছিস?

—হুঁ।

—গ্রিনল্যান্ডসে আছে। তুই এক্ষুনি চলে যা। আমিও অফিস থেকে রওনা দিচ্ছি।

—হুঁ।

—দেরি করিস না। এটা কিন্তু সিরিয়াস ম্যাটার।

—জানি।

বাণীব্রত স্থির তাকিয়ে। হয়তো এমনিই, তবু ঈষৎ অস্বস্তি হল

সুদীপার। কিন্তু বাবানকে তো ওভাবে না বললেও নয়।

টেলিফোন রেখে সুদীপা দ্রুত ফিরল নিজের টেবিলে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল একটু। যেতে তো হবেই, তার আগে আর একটা দিক দেখে নিতে হবে না? ছেচল্লিশ বছর বয়স মানুষকে অনেকটাই ঝানু করে দেয়, সুদীপার মতো পোড় খাওয়াদের তো আরও বেশি। টাইপরাইটারখানা ঢাকা দিয়ে সুদীপা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলল। আছে কিছু। খুচরো খাচরা মিলিয়ে বারোশো মতো। এত অবশ্য থাকে না রোজ। গতকাল তুলতুলির জন্মদিন গেছে। ভেবেছিল ফেরার পথে দক্ষিণাপণে নেমে বোনঝির জন্য ভাল দেখে একটা সালোয়ার স্যুট কিনবে। তা এই বারোশো টাকাতে কীই বা হবে এখন! যাক গে, একেবারে শূন্য হাতের চেয়ে তো ভাল।

ব্যাগটা নিয়েই সুদীপা টয়লেটে এল। মাথাটা জ্বালা জ্বালা করছে, কেমন যেন তাপ বেরোচ্ছে চোখমুখ দিয়ে। কল খুলে ঘাড়ে মাথায় জল ছিটোল ভাল করে। জল তেমন ঠাণ্ডা নয়, তাও আরাম হল খানিকটা। তোয়ালে রুমালে চেপেচেপে মুছছে ঘাড় মুখ গলা। হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল চন্দনের? আশ্চর্য! সকালেও কোনও আগাম ইঙ্গিত ছিল কি? সুদীপার নজরে পড়েনি। উঁহু, ভুল হল, সুদীপা লক্ষ করেনি। লক্ষ করার মতো সম্পর্কও তাদের নেই, আর সকালে অত সময়ই বা থাকে কোথায়! তার মধ্যেও মনে পড়ছে, আয়েস করে কাগজ পড়ছিল চন্দন। চা খেল, চেক লুঙ্গির ওপর কুঁচকিত বেগুনি পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে হাঁই হাঁই বাজার দৌড়োল, ফিরেই শেভিংসেট, বাথরুম, ডাইনিং টেবিল...। মাঝে কী নিয়ে যেন দাবড়াচ্ছিল বাবানকে। বাপও চেঁচাচ্ছে, ছেলেও চিমটি কেটে চলেছে...। তা ওসব তো চন্দনের সুস্থ স্বাভাবিক থাকারই লক্ষণ। অফিসে কিছু ঘটেছিল কি? কোনও কাজে টেনশন? এক্সাইটমেন্ট?

ভাবনা মাথায় টয়লেট থেকে বেরিয়ে সুদীপা দেখল খবরটা চাউর হয়ে গেছে অফিসময়। হলঘরে পা রাখতে না রাখতেই ঝাঁক ঝাঁক প্রশ্ন। টিফিনকৌটো ব্যাগে পুরে, ড্রয়ারে চাবি দিতে দিতে উত্তর দিচ্ছিল

সুদীপা।

—দাদাকে কি অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে গেল?

—তা তো জানি না।

—কী রকম অ্যাটাক দিদিমণি?

মাইল্ড? না সিরিয়াস?

—বলতে পারব না ভাই। গেলে বোঝা যাবে।

—চন্দনবাবুর কি প্রেশার ছিল সুদীপাদি?

—সে তো প্রায় বছর চারেক ধরে।

রেগুলার ওষুধ খেত।

—নিয়মিত প্রেশার চেক করাতেন?

কী জানি। বলতে গিয়েও থমকাল সুদীপা। তার আর চন্দনের সম্পর্কের চেহারাটা দু-চারজন সহকর্মী ভাসা ভাসা জানে, আলটপকা জবাবের তারা আবার কী মানে করে বসে!

আর বেশি জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগ না দিয়ে সুদীপা বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে আসতে চাইছিল দু-একজন, টাকা পয়সার কথাও বলছিল, এড়িয়ে গেল আলগা ভাবে। নিজের জন্য কাউকে বিব্রত করতে আজকাল আর ভাল লাগে না।

নীচে অফিসপাড়া যথারীতি কর্মব্যস্ত। চলছে গাড়িঘোড়া, ছুটছে মানুষজন, পাক খাচ্ছে কোলাহল। কপাল জোরে মিশন রো-এর মোড়েই ট্যাক্সি পেয়ে গেল সুদীপা। সিটে শরীর ছেড়ে দিয়েই মনে পড়ল, ইশ, দিদি জামাইবাবুদের তো খবর দেওয়া হল না! ছোড়দি অবশ্য এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি, অমিতদাও তো ট্যুরে, ওখানে ফোন করলে মা ধরবে। মাকে জানানোর কোনও মানেই হয় না। দিদি আর রমেনদাকে পাওয়া যাবে বাড়িতে। রিটায়ার করার পর বড় একটা বেরোয় না রমেনদা। নার্সিংহোমে পৌঁছে ফোন একটা করে দেওয়াই যায়। তবে রমেনদার যা নেচার, ওমনি পড়িমরি করে দৌড়ে আসবে। মিছিমিছি তাকেও উত্যক্ত করা। হ্যাঁ, উত্যক্তই তো। চন্দনের জন্য উদ্বেগে আকুল

হয়ে তো কেউ আসবে না, আসবে কর্তব্যের খাতিরে। কিংবা সুদীপার মুখ চেয়ে। কেনই বা তারা অন্তর থেকে কিছু করবে চন্দনের জন্য? তাদের সঙ্গে চন্দন কী ব্যবহারটা করে এসেছে চিরকাল! এখনও তারা বাড়ি এলে বাক্যালাপে অনীহা, প্রতিটি কথার বাঁকাচোরা জবাব...। ছোড়দি অমিতদা হাতে ধরে বুলবুলির বিয়েতে যেতে বলেছিল। গেল? ছোড়দি না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করায় মুখে কুলুপ। ভুটকান আমেরিকা থেকে ছোটমেসোর জন্য ঘড়ি নিয়ে এল, একদিনও পরে নি। সেই কবে কোনকালে নিজের বিয়েতে দেনাপাওনা নিয়ে কী খিঁচ হয়েছিল, এখনও ঝাল ঝাড়ছে! কী সব ভাষা! দুই খচড়া শালী আর তাদের এক জোড়া ঢ্যামনা বর! যাদের সম্পর্কে চন্দনের ওই সব বিশেষণ, তাদেরই ডাকতে হবে চন্দনের অসুখে?

ভাল লাগে না। ভাল লাগে না। বরং শুধু চন্দনের দিদিকে একটা খবর দিয়ে দেবে, তারা এল তো এল, না এল তো বয়ে গেল, সুদীপার দায়িত্ব শেষ। দিদিও ভাইয়েরা স্বভাব জানে, ভাইবোনে তেমন মাখামাখিও নেই, মরে গেলে কাঁদতে হয়তো আসবে। ব্যস, ওই টুকুনি।

চন্দনের মৃত্যুচিন্তা আসছে কেন মাথায়? এখনই? সুদীপা মাথা ঝাঁকাল। চোখ ফেরাল ট্যাক্সির বাইরে। মানিকতলা পেরিয়ে গেছে, সামনে কাঁকুড়গাছি, এখনও কম করে মিনিট পনেরোর পথ। কাত হয়ে আকাশটাকেও দেখল সুদীপা। কদিন বেশ নীল নীল ছিল, আজ আবার মেঘ জমছে শ্রাবণের আকাশে। রোদহীন বিকেল বেশ নরম আজ। স্নিগ্ধ। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সুদীপার। কেন যে পড়ল! ভাল লাগে না। কিছু ভাল লাগে না। অশান্তির অনন্ত ঝাঁপিতে আবার এ কী আতান্তর!

ট্যাক্সি গ্রিনল্যান্ডসে পৌঁছোল সাড়ে চারটে নাগাদ। প্রকাণ্ড নার্সিংহোম, প্রায় হাসপাতালই বলা যায়। এল্ শেপের চারতলা বাড়ি, আধুনিক স্থাপত্য, সামনে কেয়ারি করা বাগান, লনের ভেলভেট ঘাস ঘন সবুজ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে শ্রদ্ধাও জাগে, হাসপাতালে পা

রাখার প্রাথমিক আড়ষ্টতাও যেন প্রশমিত হয়।

কাচের দরজার ওপারে প্রশস্ত লাউঞ্জ। ঢুকতেই কয়েকটা আধচেনা মুখ। কালে ভদ্রে দেখা চন্দনের অফিসের লোকজন।

প্রথমেই যে এগিয়ে এল তাকে একটু বেশি চেনে সুদীপা। শ্যামল সেন। পদমর্যাদায় চন্দনের সমান সমান। ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার। যাদবপুরে বাড়ি। চন্দনের সঙ্গে এক গাড়িতে অফিস যায়। সামনে এসে শ্যামল আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, এইমাত্র ডাক্তারের সঙ্গে কথা হল। মেডিসিন স্টার্ট করে গেছে।

সুদীপা সামান্য হাঁপাচ্ছিল। অস্পষ্ট ভাবে বলল, ও।

—চিন্তা করবেন না ম্যাডাম। টাইমলি আনা হয়েছে, বেস্ট পসিবল ট্রিটমেন্ট চলছে...। শ্যামল থামল একটু। অল্প ইতস্তত করে বলল, অবশ্য অ্যাটাকটা ভালই হয়েছে। অ্যান্টিরিয়ার ওয়ালে ইনফার্কশান।

—সেটা কি বেশি খারাপ?

—একটু রিস্ক তো আছেই। তবে সেন্স যায় নি, এটা একটা প্লাস পয়েন্ট।

অর্থাৎ আর সবই মাইনাস! সুদীপার গলা আরও নেমে গেল, ডাক্তার কী বলছে? আশা আছে?

—ডাক্তাররা তো কিছু কমেন্ট করতে চায় না ম্যাডাম। একই রেকর্ড বাজায়, সিচুয়েশান ক্রিটিকাল, বাহাত্তর ঘণ্টা ধৈর্য ধরুন।

সুদীপা দু এক সেকেন্ড ভাবল আবার।

—এখন কি একবার দেখা যাবে?

—অ্যালাও করবে কি? এদের বহুৎ কড়াকড়ি। আমাদের তো নামিয়ে দিল। আই-সি-ইউতে পাঁচটা থেকে ছটা ভিজিটিং আওয়ার, তখন শুধু একজনকে দেখতে দেয়। পার্মানেন্ট কার্ডও নেই, রিসেপশান থেকে ডেলি এন্ট্রিপাস করিয়ে...

ও।

সুদীপা ঘড়ি দেখল। ছাড়পত্র পেতে এখনও পঁচিশ মিনিট।

সুসজ্জিত লাউঞ্জে দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়ছে। চাপা একটা গুঞ্জন ঘন থেকে ঘনতর ক্রমশ। হঠাৎই এক বামাকণ্ঠ বেজে উঠল ঝনঝন। বেড নম্বর ধরে পেশেন্টের বাড়ির লোককে ডাকছে মাইক্রোফোনে। মুহূর্তের জন্য থমকাল গুঞ্জন, আবার ফিরেছে আগের লয়ে।

চন্দনের অফিসের আর একজন এগিয়ে এসেছে,— ওদিকে চেয়ার খালি আছে বউদি, গিয়ে বসুন না।

—বসব?

—শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন? এখন বড় জোর ওষুধ ইনজেকশানের জন্য ডাক পড়তে পারে। ...তা আমরা তো আছিই।

ওষুধের প্রসঙ্গ কেজো কথাটাকে স্মরণ করিয়ে দিল। সুদীপা আমতা আমতা করে বলল, কিন্তু ওষুধের টাকা...

—আমাদের কাছে কিছু আছে ম্যাডাম। শ্যামল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, প্রথম ধাক্কাটা আমরা সামলে দিয়েছি।

সুদীপা সংকুচিত স্বরে বলল, অ্যাডমিশান করাতে কত লাগল?

—আপাতত দশ হাজার। পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করল শ্যামল, আপনি অ্যাডভান্সের রিসিটটা রাখুন।

—আমি কিন্তু কালকের আগে টাকাটা...

—ও নিয়ে টেনশান করবেন না। সিন্‌হা আগে সুস্থ তো হয়ে উঠুক।

রসিদ ব্যাগে পুরে সুদীপা চেয়ারে গিয়ে বসেছে। চারটে বিয়াল্লিশ। ওফ্, এক একটা সময়ে ঘড়ি যেন শামুকের মতো চলে! চন্দনকে দেখার জন্যে সে যে উতলা হয়ে উঠেছে তা ঠিক নয়। এই নিরর্থক বসে থাকাটাই অসহ্য। এ যেন বাতাসহীন শূন্যতায় আটকে থাকা। বাবানই বা এখনও এল না কেন? আজ ওদের কোথায় রিহার্সাল? যে ঝাঁকড়াচুলো মাথায় ফেট্টি ছেলেটা স্টেজে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে খঞ্জনি বাজায়, তার বাড়িতে? সে তো থাকে মহাবীর তলায়, ওখানে হলে ছটার আগে কি

পৌঁছতে পারবে?

টিপটিপ বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। কাচের গায়ে দানা জমছে বড় বড়, ওপারে চরাচর জলকণায় ঝাপসা। ভেতরে বসে সুদীপা কাঁপছিল অল্প অল্প। চোরা উৎকণ্ঠায় নয়, উত্তেজনায় নয়, ভবিষ্যৎটা ধূসরতর হয়ে যেতে পারে এমন কোনও কাল্পনিক আশঙ্কাতেও নয়, স্রেফ শীতে। উফ্, লাউঞ্জে এসিটা বড্ড চড়া। গায়ে একটা চাদর পেলে ভাল হত। ক্ষণিকের জন্য সুদীপার মনে পড়ল, অফিসে ছুটির দরখাস্ত দিয়ে আসা হল না তো! আজ মঙ্গলবার, কাল পরশু নিশ্চয়ই যাওয়া হবে না, শুক্কুরবার কী কারণে যেন হলিডে আছে...একসঙ্গে অনেকগুলো লিভ চলে যাবে! সি-এল কটা আছে আর? সুদীপা সচকিত হল সহসা। এমন একটা গুরুগম্ভীর সময়ে এসব কী তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভাবছে সে! চারটে বাহান্ন হয়েছে, এবার গুটিগুটি পায়ে যাবে কি রিসেপশানে? নাকি আর একটু অপেক্ষা করবে? বাবানের জন্যে?

চন্দনের অফিসের আরও কারা যেন ঢুকেছে লাউঞ্জে। শ্যামলদের সঙ্গে ব্যস্ত সমস্ত মুখে কথা বলছে। দুই নবাগত ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সুদীপাকে। উঁহু, চন্দন সিন্‌হার মিসেসকে। অফিসে নাকি চন্দনের যথেষ্ট সুনাম, সে নাকি কর্মঠ, পরোপকারী...! আশ্চর্য, একই মানুষের দু জায়গায় দু রকম চেহারা কী করে যে হয়? কী নিপুণ মুখোশধারী! নাকি ওটাও একটা মুখ?

শ্যামল ডাকছে। এন্ট্রি পাস করিয়ে এনে বলল, ডানপাশের লিফ্‌টটা ধরুন, ম্যাডাম। টপ ফ্লোর। আই-সি-ইউ সাত।

চারতলার ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের দরজায় পৌঁছে সুদীপা থমকে থাকল একটুক্ষণ। তারপর ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে চটি ছেড়ে ঢুকেছে ভেতরে। গোটা বারো শয্যার মাঝারি মাপের হল। এক ধারে নার্স ডাক্তারদের টেবিল, বাকি জায়গা জুড়ে পর পর বেড। নৈঃশব্দ্যের প্রলেপ মাখা ঘরে মাঝে মাঝেই বিপবিপ ধ্বনি। কার্ডিয়াক মনিটরের। বাতাসে একটা হালকা গন্ধ ভাসছে। না মিষ্টি না কটু। এখানে মুমূর্ষু

রোগীদের আলাদা করে চিনে নেওয়া কঠিন, হঠাৎ তাকালে সবাই যেন এক রকম। এ কি উগ্র শুভ্র আবহের গুণ? নাকি সংকটকালে মানুষে মানুষে প্রভেদ কমে আসে? চন্দনকে অবশ্য খুঁজতে হল না বিশেষ। বাঁয়ে দু চার পা যেতেই আই-সি-ইউ সাত। বুক অবধি চাদরে ঢাকা, মুখে অক্সিজেন মাস্ক, কবজি ফুঁড়ে তরল ঢুকছে বিন্দু বিন্দু, নিথর পড়ে আছে চন্দন। চাদরের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে কালো হলুদ তার, সংযোজিত হয়েছে কার্ডিয়াক মেশিনে। বেডের মাথায় মনিটার, সেখানে সবজেটে পরদায় হৃদয় তরঙ্গের অবিরাম ওঠাপড়া। নাড়ির গতিও মাপা চলছে যন্ত্রে, ফুটে উঠেছে রক্তাভ সংখ্যা। এই আশি তো এই চুরাশি, বিরাশি, উননব্বই...

সুদীপার গা শিরশির করছিল। এতদিনের চেনা চন্দন যেন অচেনা সহসা। এমন আচ্ছন্ন অবস্থায় কখনও দেখে নি চন্দনকে। ঠোঁটদুটো ঈষৎ ফাঁক। জেগে আছে কি? ডাকবে?

প্রয়োজন হল না। চন্দনই খুলেছে চোখ। সুদীপার উপস্থিতি কি টের পেল?

আমার বই . কম
amarboi.com

একটু ঝুঁকল সুদীপা, এখন কেমন ফিল করছ?

সাড়া নেই। দৃষ্টি ঘোলাটে। সম্ভবত সিডেটিভের ঘোর।

সুদীপা ফের বলল—বুকব্যথা কমেছে?

এবার যেন চোখের মণি চঞ্চল সামান্য। কোনও ভাষা ফুটল কী? কষ্টের? অসহায়তার? মৃত্যুভয়ের? কিংবা বিরক্তি? খুশি? নাকি সব অনুভূতিই এখন মিলেমিশে একাকার! সুদীপা বুঝতে পারছিল না।

২

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে আবার। সঙ্গে উথাল পাথাল হাওয়া। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। গুম গুম হাঁক পাড়ছে মেঘ। কাছেই কোথাও একটা বাজ পড়ল, কেঁপে উঠল গোটা অঞ্চল। সুদীপা শুয়ে ছিল। আড়াআড়ি হাতে চোখ চেপে। বাড়ি ফিরেছে আধ ঘণ্টাটাক আগে, এখনও অফিসের শাড়িজামা বদলানো হয়নি। ইচ্ছে করছে না। ক্লান্তি, অসহ্য ক্লান্তি, যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে মাথা। অবশ ভাবে টের পাচ্ছে ছাঁট ঢুকছে ঘরে, ভিজছে বিছানা বালিশ। তবু উঠে বন্ধ করছে না জানলা। ইচ্ছে করছে না। স্মৃতির পরদায় পর পর অসংখ্য ছবি। এলোমেলো ভাবে তাদের ঘাঁটছিল সুদীপা। গোছগাছ করে সাজাচ্ছিল। দেখছিল সময়ের ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে। এতকাল পর এ সবের কোনও মানেই হয় না, সুদীপা জানে, তবুও।

অনেক কাল আগের এক রবিবারের বিকেল। সুদীপাকে দেখতে

এসেছে পাত্রপক্ষ। চন্দনের বাবা মা দিদি। চন্দনও। খবরের কাগজ দেখে সম্বন্ধ, চিঠি চালাচালি আর ফটো আদান প্রদানের পালা সাঙ্গ হয়েছে, এবার চাক্ষুষ দর্শন। কী সৌভাগ্য, জীবনের প্রথম সিটিং-এই সুদীপা পাশ। প্রথম দেখায় সুদীপারও বেশ পছন্দ হয়েছে ছেলেটাকে। শ্যামলা শ্যামলা রং, পেটা চেহারা, হাইটটাও চলনসই, ডিগ্রিধারী না হলেও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। এর বেশি আর কী চাই তার মতো এক সাধারণ মেয়ের! রংটা তার ফর্সা বটে, কিন্তু ডানা কাটা পরী তো নয়।

তা সেই বিয়ে পাকা হতে হতেও হঠাৎ কেঁচে যাওয়ার উপক্রম। পাত্রপক্ষের নতুন দাবি, বিশহাজার নগদ চাই। শুনে সুদীপার বাবা খেপে লাল। নতুন করে ওই টাকা জোগাড় হবে কোথথেকে! হলেও পণ দিয়ে মেয়ে পার করবেন কেন! অতএব ওই বিয়ে বাতিল, আবার উঠে পড়ে পাত্র খোঁজা।

সুদীপারও খুব খারাপ লেগেছিল। দিনক্ষণ ঠিক করেও ছেলের বাড়ির এ কী অভব্যতা। অথচ ঘুরেফিরে ওই অভব্য বাড়িতেই বিয়েটা হল। সুদীপারই বায়নায়। একেই কি বলে কপাল? নাকি নিয়তি?

কিংবা নিছকই সুদীপার বোকামি?

আরও একটা রংজ্বলা ছবি স্পষ্টতর হচ্ছে। টাইপ ক্লাস থেকে বেরিয়েছে সুদীপা, সামনে চন্দন।

গটগট এগিয়ে এসে চন্দনের সরাসরি প্রশ্ন, তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ, আমাদের বিয়েটা ভেঙে গেছে?

মুহূর্তের জন্য সুদীপা থতোমতো। পরক্ষণে গোমড়া গলায় জবাব, কারণটাও জানি।

—আমি কিন্তু তোমাকেই বিয়ে করতে চাই।

—তাই বুঝি? আমি তো চাই না।

—কেন? তোমার কি আমাকে পছন্দ নয়?

—এখন আর ওসব প্রশ্ন ওঠে কি?

—তুচ্ছ দেনাপাওনার কারণে বিয়েটা ভেঙে যাবে?

—আপনার কাছে এটা তুচ্ছ মনে হচ্ছে?

—ওভাবে ধরছ কেন? বিয়েতে তো অনেক ফালতু খরচ খরচা হয়। সামান্য বিশ হাজার টাকা নয় তোমার ভবিষ্যৎ সংসারেই এল।

—মানে?

—টাকাটা তো বাবা খাবে না, সংসারেই থাকবে। আই মিন... সেটা তো তখন তোমারও সংসার। অর্থাৎ ফয়দা আল্‌টিমেট্‌লি তোমার। চন্দন কাঁধ ঝাঁকাল,—এই সামান্য কথাটা যে কেন তুমি বুঝছ না!

—বাহ্, পণ নেওয়ারও তো সুন্দর যুক্তি খাড়া করে ফেলেছেন! সুদীপা নাক কুঁচকোল,—মাপ করবেন। অত টাকা দিয়ে মেয়ের সুখ কেনার ক্ষমতা আমার বাবার নেই। যে মেয়ের বাপ ওই টাকা দিতে পারবে আপনি সেখানেই ঝুলে পড়ুন।

একটুক্ষণ চন্দনের মাথা হেঁট। কী যেন ভাবছে। তারপর বলল—আমি একটা সলিউশান ভেবেছি।

—কিসের সলিউশান?

—একটা অ্যাডজাস্টমেন্টের। যাতে দু পক্ষেরই মান থাকে।

—বুঝলাম না।

—ধরো, যদি টাকাটা আমিই দিয়ে দিই?

—আপনি?

—হ্যাঁ। আমি তোমায় দিলাম, তুমি তোমার বাবাকে দিলে, তোমার বাবা...একটু কায়দা করে ম্যানেজ করা, আর কী!

সুদীপা হতবাক। এসব কী বলে রে বাবা!

—কী, প্ল্যানটা ভাল নয়?

—অবশ্যই না। আপনি কী বলছেন নিজেও জানেন না।

—আমি কিন্তু ভেবেচিন্তে বলছি।

—দেখুন, এটা একটা নীতিগত ব্যাপার। এর সঙ্গে আমরা বাবার

মানসম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। আমারও। আপনি ভাবলেন কী করে আপনারই টাকা নিয়ে আমি আপনার গলায় মালা দেব? আমি কি এতই ফ্যালনা?

—বটেই তো। চন্দন যেন কথাটা লুফে নিল, জানো, এই নিয়ে বাবার সঙ্গে আমার ফাটাফাটি পর্যন্ত হয়ে গেছে!

—তবু তাঁকে নড়াতে পারেন নি, তাই তো?

—বাবা বড্ড একগুঁয়ে। একবার যা ঠিক করবে...

—আমার বাবাও তাই। আমিও। পথ ছাড়ুন।

—কক্ষনও না। স্থানকালপাত্র ভুলে খপ করে সুদীপার হাত চেপে ধরেছে চন্দন, বিশ্বাস করো সুদীপা, তোমাকে দেখার পর থেকে আমার কী যে হয়েছে...! বিয়ে করলে তোমাকেই করব, নইলে আর কাউকে নয়।

—আহ্, কী সিন ক্রিয়েট করছেন? হাত ছাড়ুন।

—সুদীপা, প্লিজ। আমায় ফিরিয়ে দিয়ো না। চন্দনের হাত কাঁপছে থরথর—আমি তোমাকে চাই সুদীপা। যে কোনও উপায়ে। যে কোনও মূল্যে। নীতি ফিতি আমি কিছু বুঝি না। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

আমার বই ডট কম
amarboi.com

তখনই কি সুদীপার বোঝা উচিত ছিল, চন্দন পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়? কিন্তু যুক্তি বুদ্ধি তখন কাজ করল কোথায়! তার মতো একটা মামুলি মেয়েকে কেউ যে অমন তীব্র ভাবে চাইতে পারে, এ তো তখন সুদীপার কাছে অকল্পনীয়। ওই বয়সে ওই মুহূর্তে, ওই আকুল নিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করা কি সম্ভব? পারে কোনও মেয়ে? যখন পুরুষটিকেও তার মোটামুটি মনে ধরেছে? তারপর তো জট পাকানো ছবি। লড়ালড়ি, কান্নাকাটি, কত নাটক...। মা দিদিরা পাশে না থাকলে থোড়াই বাবার গোঁ ভাঙত। রাজি হওয়ার পরেও তিনি বলেছিলেন, কাজটা কিন্তু ভাল হল না, দীপু। পরে পস্তাতে হতে পারে।

ভাল যে হয় নি, সে তো সুদীপা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। প্রতি পদে। চব্বিশটা বছর ধরে। সুদীপার বুক নিংড়ে একটা লম্বা শ্বাস গড়িয়ে

এল। সত্যি, কী এক পরিবারেই না পড়েছিল সে! শ্বশুর শাশুড়িরও কী ছিরি! একজনের দাপটে গগন ফাটে, অন্যজন মেরুদণ্ডহীন কেন্নোপোকা। শ্বশুরমশাই তাও বাবান হওয়ার পর পর মরে গিয়ে রেহাই দিয়েছিলেন, শাশুড়ি ঠাকরুন জ্বালিয়েছেন আরও এগারো বছর। ছেলের অসাক্ষাতে বউয়ের দলে, ছেলে ফিরলেই ছেলের আগুনে ঘি ঢালছেন! কী আজব এক চরিত্র! আর চন্দন? সে তো সব হিসেবের বাইরে।

আবার একটা বিবর্ণ ছবি ঝলসে উঠছে। হানিমুন সেরে সবে ফিরেছে সুদীপারা, বাবা মা খেতে ডেকেছে রাত্রে, তিন মেয়ে জামাইনাতি নাতনি নিয়ে ছোটোখাটো এক গেট টুগেদার। বাড়ি ফিরেই চন্দনের চোখ সরু, একটা খবর আমার কাছে বেমালুম চেপে গেছ?

সুদীপা অবাক,—কী বলো তো?

—তোমার বড়দির দেওরের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা চলছিল?

—ওমা, সে তো তোমার বাবার সঙ্গে কথাবার্তা ভেস্তে যাওয়ার পর। তারপরতো তুমিই এসে সব ওলটপালট করে দিলে।

—তোমার দিদির নিজের দেওর?

—উহুঁ। পিসতুতো।

—সে নাকি খুব ব্রাইট ছেলে?

—বলতে পারো। যাদবপুরের কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ার, ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ দিয়ে পিকক পেন্টসের মতো কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে...

—চেনো তাকে? আলাপ আছে?

—থাকবে না কেন? দিদির বাড়ির সব কাজেকর্মেই তো আসে রাতুলদা।

—দেখতে কেমন?

—ঠিকই আছে। ফর্সা ফর্সা। লাল্টু লাল্টু।

—ও। ...তার মানে আমি জোর করে মাঝখানে ঢুকে পড়াতে তোমার খুব লস হয়ে গেল!

—কীসের লস?

—আমি জাবপাত্রে বসে না পড়লে তোমার রাতুলদার মতো একটা ঝকঝকে বর তুমি পেয়ে যেতে। ডিপ্লোমার বদলে ডিগ্রিধারী ইঞ্জিনিয়ার।

—বটেই তো। বটেই তো। সুদীপা তখনও হাসছে ফিকফিক, উফ, কী আফশোস যে হয়! জানো তো, কোম্পানি কী দারুণ একটা ফ্ল্যাট দিয়েছে রাতুলদাকে! ওয়েল ফারনিশ্‌ড। ফ্রিজ টিভি টেলিফোন, কী নেই?

চন্দনের মুখ পলকে পাংশু। চোয়াল পাথরের মতো কঠিন। চোখ জ্বলছিল।

—অ্যাই? অ্যাই? কী হল তোমার?

উত্তর নেই। খাটে বসে সিগারেট ধরিয়েছে চন্দন। হুশ হুশ দু তিনটে টান, তার পরই আঙুলের টোকায় জ্বলন্ত সিগারেট জানলার বাইরে। ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবছে।

সুদীপা ছুটে গিয়ে চন্দনকে জড়িয়ে ধরেছে—এমা, কী বোকা গো তুমি! আরে দূর, রাতুলদার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় নাকি? ওরা কত হাইফাই ফ্যামিলি। তাছাড়া রাতুলদাকে আমার তত ভালও লাগে না। বড্ড কেতা। সাহেব সাহেব। তার চেয়ে আমার বাবা ডিপ্লোমা বরই ভাল!

চন্দন আর কথা বাড়াল না কোনও। প্রবল রিরংসায় মাতল মৈথুনে। ছিঁড়ে খুঁড়ে চিরে ফেঁড়ে দখল নিল সুদীপার।

সে রাতেও কি চন্দনের মানসিক বিকৃতির মাত্রাটা অনুমান করতে পেরেছিল সুদীপা? উঁহু। টের তো পেল আরও অনেক পরে। বদলাচ্ছে দৃশ্য। বদলাচ্ছে... বদলাচ্ছে...

সুদীপার নামে হঠাৎই একটা চিঠি। খামে। খুলে সুদীপা হতচকিত। রাতুলদা লিখেছে! কী অভাবনীয় বয়ান! রাতুলদার নাকি মনে মনে পছন্দ ছিল সুদীপাকে! তার সঙ্গে বিয়েটা হল না বলে খুব আঘাত

পেয়েছে রাতুলদা! একবার অন্তত সে সুদীপার সঙ্গে দেখা করতে চায়! ভিক্টোরিয়ার পুবগেটে যেন আসে সুদীপা। শনিবার, বিকেল তিনটেয়!

বার বার পড়েও সুদীপার বিশ্বাস হচ্ছিল না। রাতুলদার ভীমরতি হল নাকি? দিদিকে গিয়ে দেখাবে চিঠিটা? না না, বিশ্রী একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। আর চন্দন যা হিংসুটে, তাকে তো জানানোই যাবে না। সাত পাঁচ ভেবে সুদীপা চিঠিটা কুচিয়ে ফেলে দিল।

দিন পনেরো পর আবার পত্রাঘাত। প্রায় একই ভঙ্গিতে প্রণয় নিবেদন, দেখা করার জন্য কাতর অনুনয়।

সুদীপা রীতিমত নার্ভাস এবার। কী হচ্ছে ব্যাপারটা? রাতুলদার কি এই কাজ এখন শোভা পায়! তার মতো সামান্য একটা মেয়ের জীবনে ঝড় তুলে কী সুখ পাচ্ছে রাতুলদা! এখন সে বিবাহিতা, কোনও অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার কথা সে ভাবতেও পারে না। এই চিঠিটাও কুচি কুচি করে ফেলে দিল সুদীপা।

মাস খানেক পর ফের পত্রবোমা। এবার কাকুতিমিনতি। একবার, মাত্র একটি বার সুদীপা যেন দেখা করে তার সঙ্গে! কেন তাকে এমন বিমুখ করছে সুদীপা!

বারবার তিন বার। নাহ, এবার হেস্তনেস্ত দরকার।

নির্দিষ্ট দুপুরে বেরিয়ে পড়ল সুদীপা। চিঠির প্রার্থনা মতো মেট্রো সিনেমার সামনে হাজির। কাঁটায় কাঁটায় দুটোয়। ছায়া দেখে দাঁড়িয়েছে সবে, হঠাৎ পিছনে চন্দন!

—তুমি?

চন্দনের ঠোঁটে ধূর্ত হাসি, কী, ধরা পড়ে গেলে তো? এর পরও বলবে তোমার রাতুলদার ওপর কোনও দুর্বলতা নেই?

সুদীপা ঝরঝর কেঁদে ফেলেছিল সেদিন। আজও ভাবলে গা রি রি করে ওঠে। কতটা কুটিল হলে মানুষ ওই ধরনের খেলা খেলতে পারে! অবশ্য রাগে ঘেন্নায় সেদিনই বাপের বাড়ি চলে গেছিল সুদীপা। ওই বিকারগ্রস্ত মানুষটার সঙ্গে আর থাকবে না। প্রায় হাতে পায়ে ধরে চন্দন

তাকে ফিরিয়ে এনেছিল সেবার।

কিন্তু মানুষটার কোনও বদল ঘটল কি? আসলে চন্দনের বুকে সব সময়ে একটা পোকা কিলবিল করে। সেই কীট অলীক লালা বিছিয়ে জাল বুনে চলে অবিরাম। সংশয়ের। সন্দেহের। অবিশ্বাসের। হীনম্মন্যতার। ওই বিষাক্ত রসেই জারিত হয় শঠতা ক্রূরতা নীচতা। কাকে না জড়িয়ে সুদীপাকে সন্দেহ করেছে চন্দন! পিতৃতুল্য না হলেও রমেনদা তো বড় দাদার চেয়ে কম নয়, তাকে নিয়ে পর্যন্ত কী অশালীন ইঙ্গিত! বেচারা অফিসের টেকো বাণীব্রতও ছাড় পায় নি। কেন ওই ভামের বাচ্চা মিনিবাসের লাইনে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে অত গপ্পো করে, অ্যাঁ! নিজেরই এক মামাতো ভাই এল দিল্লি থেকে, সুদীপার চেয়ে কত ছোট, তাকে দেখেও নাকি ঢলে ঢলে পড়েছে সুদীপা! আরও কত ছবি আছে যে এরকম! খুঁজতে গেলে রাত ভোর হয়ে যাবে। তবু চব্বিশটা বছর তো রয়ে গেল সুদীপা। কেন থাকল? কেনই বা পালায় নি? চাকরি বাকরি একটা শক্ত জমি তো সে পায়ের নীচে বানিয়ে ফেলেছিল, তাহলে তার কীসের পরোয়া।

আমার বই . কম
amarboi.com

দিব্যি আলাদা হয়ে যেতে পারত ছেলে নিয়ে। কেন যায় নি? চন্দন বার বার মেলোড্রামা করে আটকে দিয়েছে, তাই? এক চুমুক ফিনাইল গলায় ঢেলে রাতদুপুরে বমি, পাখার সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ার শাসানি, ট্রেনে গলা দেবে বলে হাউমাউ করে ছোটা...কত নাটক যে দেখিয়েছে!

চন্দন আত্মাহুতি দেবে এই ভয়েই কী পিছিয়ে গেছে সুদীপা? সে কি জানে না চন্দনের মরার সাহসটাও নেই?

খুব জানে। ভালই জানে। তবু সুদীপা আছে। সে না থাকলে চন্দনের সন্দেহের আধারটাই তো খসে যাবে, এতটা স্বস্তি চন্দনকে সে দেবে কেন? লোকটা সারা জীবন তার হাড়মাস কালি করল, কেন তাকেও সে দগ্ধে দগ্ধে মারবে না! নিজের সন্দেহের আগুনে নিজেই জ্বলে খাক হয়ে যাক চন্দন, ছটফট করুক, সে গাল পাড়লে সুদীপাও নয়

মুখ ছোটাবে। হ্যাঁ, প্রতিহিংসার শিকল ভালবাসার মালার চেয়ে অনেক বেশি মজবুত, সুদীপা এটুকু অন্তত বুঝে গেছে।

ভাবনার মাঝেই ক্ষীণ এক ধাতব ধ্বনি। দুরন্ত বৃষ্টি ভেদ করে হানা দিচ্ছে আওয়াজটা। যেন পাড় ভেঙে ধেয়ে আসছে সময়।

উচ্চকিত হচ্ছে ক্রমশ। থেমে গেল সহসা। আবার বাজছে। আবার আঘাত হানছে কানের পরদায়।

আরে, এ তো টেলিফোন! সুদীপা ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

নার্সিংহোম থেকে নয় তো? লুটোনো আঁচল সামলাতে সামলাতে ত্বরিত পায়ে সুদীপা ড্রয়িং-ডাইনিং হলে। রিসিভার তুলে জোরে জোরে দম নিচ্ছে।

কী রে, কী করছিলি? রিং হয়েই যাচ্ছে, হয়েই যাচ্ছে!

দিদি।

সুদীপা গলা ঝাড়ল—ও, তুই! শুয়ে ছিলাম রে। চোখটা একটু লেগে গেছিল।

—তুই কীই রে? এত বড় একটা বিপদ, আমাদের একটা খবর দিলি না?

—বাবান ফোন করেছিল বুঝি?

—এই তো, মিনিট আট দশ আগে। হঠাৎ কী করে হয়ে গেল?

—হল। হওয়ার ছিল।

—তুই কখন খবর পেলি? অফিসে?

—হুঁ।

—তখনই জানাস নি কেন? বেচারা বাবান ওখানে একা, ভুটকানও রাত্তিরে থাকতে পারত।

—একা কোথায়? ওর এক বন্ধু আছে তো।

—তবু...

—টেনশান করিস না দিদি। কারুর তো কিছু করার নেই। এক যদি না...

—এখন আজে বাজে কথা ভাবতে নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সব কী আর ঠিক হয়? সম্ভব?

—শোন, লেখাকেও আমি জানিয়ে দিয়েছি। বারণ করেছি মাকে এখন কিছু বলতে। ও তোকে একটু রাত করে ফোন করবে। মা শুয়ে পড়ার পর। শুনলে মার আবার কী রিঅ্যাকশান হয়...

—মা ওখানে গেছে বলেই তো ছোড়দির বাড়ি আর ফোন করি নি।

—সে তো আমাদেরও করিস নি, দীপু। চন্দনের সঙ্গে থেকে থেকে তুইও একটা কমপ্লেক্সের ট্যাবলেট বনে গেছিস। বিপদ আপদে আপনজনদের ডাকলে মনের ভার অনেকটাই লাঘব হয়, বুঝলি।

দিদির স্বরে অভিমান, যাক গে যাক, তোর রমেনদা কী বলতে চায় শোন।

বলতে না বলতেই ওপারে রমেনদা—ঘাবড়াস না দীপু, আমরা আছি। কাল সকালেই আমি গ্রিনল্যান্ডসে চলে যাচ্ছি।

—তাড়াহুড়োর কী আছে রমেনদা! বেলায় গেলেও চলবে।

—আহা, সকালে গিয়ে বাবানকে রিলিফ করতে হবে না! নার্সিংহোমে এখন সারাক্ষণই একজনের থাকা দরকার। ...আর হ্যাঁ, টাকাপয়সা লাগলে বলিস, হেজিটেট করিস না।

—বলব।

—খাওয়া দাওয়া করেছিস?

—বসব এবার।

—অল্প কিছু হলেও খেয়ে নে। শরীরকে কষ্ট দিস না। বাবানকেও বলেছি, তোকেও বলছি, রাতে দরকার হলে ফোন করিস।

—করব।

রিসিভার রেখে সুদীপা বাথরুমে গেল। বৃষ্টির তেজ কমেছে একটু, এখন শুধু একটা একঘেয়ে শব্দ আসে ধারাপাতের। শব্দটা কানে নিয়েই বেসিনের আয়নায় নিজেকে দেখছিল সুদীপা। লাবণ্য ঝরে যাওয়া একটি

আমার বই . কম
amarboi.com

মুখ। খসখসে চামড়া, মরা মরা, ইতিউতি ভাঁজ। গাল দুটোও আর তেমন ভরাট নেই, চোখের পাতাতেও ফোলা ফোলা ভাব। রূপসী না হোক, কিন্তু একটা আলগা শ্রী তো ছিল, এখন সেখানে ম্যাড়মেড়ে রুক্ষতা। চন্দনের সঙ্গে লড়াই চালাতে চালাতে, কোণঠাসা বেড়ালের মতো ফ্যাঁসফোঁস করতে করতে মাত্র ছেচল্লিশেই কেমন বুড়িয়ে গেল সুদীপা! একটা ভুল জীবন যাপনের পরিণাম। কিংবা একটা বিষাক্ত সম্পর্ককে অনাবশ্যক দীর্ঘায়িত করার অবশ্যম্ভাবী ফল।

নিজেকে দেখতে দেখতে আচমকা সুদীপা কাঠ। তার প্রতিবিম্বের পিছনে আয়নায় ও কার ছায়া? মুখে অক্সিজেন মাস্ক, হাতে ফ্লুয়িডের নল, এক ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে? মুহুর্মুহু কিসের শব্দ বাজে ওই? বিপবিপ! বিপবিপ! অস্বচ্ছ দৃষ্টি সুদীপাকে অতিক্রম করে দেওয়াল ফুঁড়ে চলে যাচ্ছে দূরে কোথায়!

ওই অশান্ত ধ্বনি কি মৃত্যুর সংকেত? সুদীপার গা ছমছম করে উঠল। নির্জন ফ্ল্যাটে, নির্জনতর বাথরুমে দাঁড়িয়ে সুদীপার মনে হচ্ছিল, চন্দন বোধহয় মরে যাচ্ছে। এবার বুঝি মুক্তি পেতে চলেছে সুদীপা।

ফের একটা বাজ পড়ল কোথাও। ভয়ংকর গর্জন স্তিমিত হওয়ার পরেও রেশটা রয়ে গেল অনেকক্ষণ। গুমগুম গুমগুম গুমগুম...

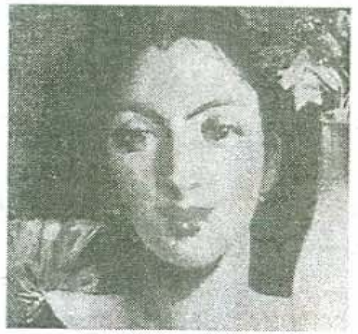

৩

আমার বই . কম

—তোকে আর এক পিস টোস্ট দিই, বাবান?

—নাহ।

—মাত্র দু পিস খেয়েই হয়ে গেল?

কলাও তো খেলি না আজ?

—ভাল লাগছে না।

বাবান মাথা নিচু করে ওমলেট খুঁটছে। পাশে দুধের গ্লাস। খানিক আগে ফিরেছে নার্সিংহোম থেকে। পর পর দু-রাত জাগরণে চোখ মুখ বেশ শুকনো শুকনো। রাত্তিরে তার ডাক পড়েনি ঠিকই, চন্দনের অবস্থা এখনও একই রকম, তবু নার্সিংহোমের পরিবেশে কি শান্তিতে চোখ বোজা যায়! আজ তো তাও খাবার টেবিলে বসেছে, কাল ফিরেই সটান বিছানা নিয়েছিল। সুদীপার খারাপ লাগছিল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল—ঘুমোনোর আগে ভাল করে স্নান করে নে। আরাম লাগবে।

—আজ ঘুমোনোর উপায় নেই মা। বেরোতে হবে।

—কোথায় যাবি?

—রোববার আমাদের প্রোগ্রাম।

—কোথায়?

শ্রীরামপুরে। রোজ রোজ রিহার্সাল বাংক করা যায় না।

—ও...তার মানে আজ আর নার্সিংহোমে যাবি না?

—বিকেলে পারব না। বাবান চোখ তুলল, রাতে থাকতে হলে ফোন করে দিও, টাইমলি পৌঁছে যাব।

—আজ তোকে নাইট-স্টে করতে হবে না। ভুটকান বলছিল কাল ওর ছুটি, যদি প্রয়োজন হয়...

—প্রয়োজন আবার কী! স্টে করাটাই তো ফালতু। তেমন সিচুয়েশান হলে নার্সিংহোমই তো বাড়িতে ফোন করবে। বাবান দুধে চুমুক দিল, আমার তো মনে হয় বিকেলেও একগাদা ভিড় জমানোটা মিনিংলেস। কিছুই করার নেই, শুধু ঝাঁক বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা।

বা রে, অসুখ বিসুখের খবর পেলে লোকজন যাবে না।

বাবান কথাটাকে পাত্তা দিল না। ঠোঁট মুছতে মুছতে উঠে পড়ল। চলে যাচ্ছে নিজের ঘরে। ছেলের এই নিরাবেগ প্রস্থানই বুঝিয়ে দেয় বাবার চিন্তায় মাথার চুল ছিঁড়তে সে মোটেই রাজি নয়। নার্সিংহোমে রাত্রিবাসেও কি বাবানের মন থেকে সায় ছিল? যাকে বলে প্রাণের টান? কিংবা রক্তের?

তাও তো করছে কিছু। সুদীপা এটুকুও আশা করে নি। বাপ ছেলের যা সম্পর্ক! সর্বক্ষণ দুজনে যেন যুযুধান প্রতিপক্ষ, শান দিচ্ছে তলোয়ারে।

অথচ এই বাবান জন্মানোর পর চন্দন কী খুশিই না হয়েছিল! ঘুরে ফিরে হাঁ করে দেখছে ছেলেকে। আলতো ভাবে ছুঁচ্ছে কচি কচি আঙুল হাত পা। যেন কোনও মহামূল্যবান পুতুল। গদগদ স্বরে কত না প্রলাপ! এই দ্যাখো, চোখদুটো ঠিক আমার মতো না! ব্যাটার বডি কালারটাও

মনে হচ্ছে বাপের দিকেই যাবে! নাকটা কেমন বড়ি বড়ি, তোমার মতো! ছেলের দৃষ্টি ভাল করে ফোটার আগে প্যারাম্বুলেটার চলে এল, হামা টানার আগে ওয়াকার। রাশি রাশি খেলনা ট্রাইসাইকেল মোটরগাড়ি। কী না আসছে!

তা সেই নয়নের মণি হয়ে গেল চক্ষুশূল। না, ঠিক তা নয়, বলা যেতে পারে সুদীপার ওপর রাগ দেখানোর অন্যতম আধার। ছেলেকে খানিক পিটিয়ে নিয়ে সুদীপার গায়েই যেন জলবিছুটি ঘসা।

দু একটা ঘটনার কথা ভাবলে এখনও সুদীপার গায়ে কাঁটা দেয়। সুদীপা তখন চাকরিতে ঢুকেছে, অশান্তি আবার ফিরে এসেছে পূর্ণ দমে এবং সুদীপাও তখন আর ছোড়নেওয়ালি নয়, চন্দন বল্লম ছুঁড়লে সেও কুকরি চালায়।

মলিনাদির রিটায়ারমেন্ট। অফিসে ফেয়ারওয়েল ফাংশান। সুদীপার ফিরতে দেরি হয়েছিল। বাড়িতে পা রাখতেই চন্দনের হুংকার, কোথায় ঢলাচ্ছিলে এতক্ষণ?

পলকে সুদীপাও তপ্ত—একটা হোটেলে পুরুষবন্ধু নিয়ে ফুর্তি মারছিলাম।

আমার বই.কম
amarboi.com

—সেখানেই রাতটা কাটাতে পারতে।

—ভুল হয়ে গেছে। এবার থেকে তাই করব।

ব্যস, চলছে মিসাইলের বদলে পালটা মিসাইল। ক্রমশ গলা চড়ছে চন্দনের। সুদীপারও। বাবান তখন বছর সাতেকের। বাবা মার নিত্য ঝগড়া দেখে কেমন যেন সিঁটিয়ে থাকে। সে কাতর স্বরে বলে ফেলেছিল, চুপ করো না বাবা। মা তো ঠাম্মাকে বলেই গেছে দেরি হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলের গালে সপাটে চড়। ছিটকে গিয়ে খাটের বাজুতে ঠোক্কর খেল বাবান। কপাল ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড।

আর একবারও নিজেরই মনগড়া কারণে। ভুটকান মাধ্যমিকে দারুণ রেজাল্ট করেছে, দিদির বাড়িতে জোর খাওয়া দাওয়া, যথারীতি

চন্দন যায় নি। ফিরে এসে মা ছেলেতে বিরিয়ানি চাঁপ নিয়ে গল্প করছিল, হঠাৎই চন্দনের চণ্ডমূর্তি। চোখ পাকিয়ে তেড়ে এল ছেলেকে। চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাচ্ছে। এত কিসের নোলা, অ্যাঁ! বাড়িতে খেতে পাস না! কার ছেলে কী করেছে বলে বারফাট্টাই মারছে, তোরা সেখানে কুকুরের মতো পাত চেটে এলি? তা, কেন ওই আকস্মিক বিস্ফোরণ? শুধুই দিদি রমেনদাকে অপছন্দ, তাই? উঁহু। রাতুল। চন্দন মনে মনে হিসেব করে দেখেছে রাতুলও নির্ঘাৎ আসবে ও বাড়িতে। আর সেই টানেই ছুটেছে সুদীপা।

হ্যাঁ, রাতুলের ভূত চন্দনের ঘাড় থেকে আর নামল না। রাতুলের কবেই বিয়ে হয়ে গেছে, সুন্দরী বউ, ছেলেমেয়ে নিয়ে সে এখন ঘোর সংসারী, এত সব জানার পরও। এখনও কথায় কথায় আকাশ থেকে নেমে আসে ভূতটা। ফ্ল্যাটটা কিনেও সুদীপাকে খোঁচা, মেঝেটা দ্যাখো। মোজাইক নয়, আসলি মার্বেল। খোদ মাকরানা থেকে আনা। তোমার রাতুলদার ফ্ল্যাটে আছে এই কোয়ালিটির মাল? ফ্রিজ টিভি যাই কিনুক, কোনও না কোনও ভাবে রাতুলদার সঙ্গে তুলনা। গত পুজোয় নিজেই ওয়াশিং মেশিন কিনে দিল, সুদীপাকে সেধে সেধে নিয়েও গেল পছন্দ করাতে, ক্রেডিটকার্ডে ঝাং পেমেন্ট করেই টুকুস মন্তব্য, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররাও এসব কিনতে পারে, বুঝলে। অফিসের নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ছেলেগুলো ডিগ্রিধারী হয়েও কত অপদার্থ, মাঝে মাঝেই সুদীপাকে তা শুনতে হয়। সে শুনুক, কান বন্ধ করে থাকুক, আপন মনেই বকে চলে চন্দন।

তা সুদীপা নয় প্রতিবাদের ছররা ছুঁড়ে মোকাবিলা করে লোকটার। ঘেন্না নিয়েও এক বিছানায় শুতে পারে। কিন্তু বাবান তাকে মেনে নেবে কেন! একটু চোখ কান খুলতেই শুরু হল তার বিদ্রোহ। বাবা যা চাইবে তার উলটো পথে চলবে। বাবার ইচ্ছেকে অগ্রাহ্য করার জন্যই সায়েন্স নিয়ে পড়ল না, কম্পিউটার ট্রেনিং-এ গেল না, বি-এ পাশ করে ভিড়ল গিয়ে গানের জগতে। সাত আট জন বন্ধু মিলে দল বানিয়েছে বাংলা

ব্যান্ডের। ধূমকেতু। গান লেখে দলেরই একটি ছেলে, বাবান সুর দেয়, মুখ্য গায়কও বাবানই। প্রথম কয়েকদিন নিজের ঘরে রিহার্সালের আয়োজন করে তুমুল অশান্তি ডেকে এনেছিল বাড়িতে। এ ঘরে চন্দন মুঠো পাকাচ্ছে, গজরাচ্ছে, ও ঘরে ঝাং ঝাং বাজনা। ছেলেগুলো চলে যেতেই ফেটে পড়ছে বাপ, তাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে ছেলে, ওফ্ সে একদৃশ্য ছিল বটে।

ছেলের এই আচরণে সুদীপা কি খুশি? সুদীপা ঠিক বুঝতে পারে না। ব্যথিত? তাও বুঝতে পারে না। তবে ছেলে যে মায়ের দলে হয়ে বাবাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, এ ভাবনায় এক ধরনের সুখ তো আছেই। হয়তো বা চোরা তৃপ্তিও। তা বলে বাবানের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তাও কি হয় না?

ছেলেকে সে জিজ্ঞাসাও করেছে—হ্যাঁ রে বাবান, এভাবেই চালাবি?

—খারাপ কী চলছে মা? প্রোগ্রাম টোগ্রাম তো পাচ্ছি।

—সে আর কটা?

—বাড়বে। বাড়বে। এবার রেকর্ডিং করাব। ধূমকেতুর সিডি বেরোবে।

আমার বই .কম
amarboi.com

—সেও নয় হল। তার পর?

—নাম হবে, যশ হবে, লোকে শুনে বাহবা দেবে, হু হু করে বিক্রি হবে...। বাবান সুর করে গেয়ে উঠেছিল, ধূমকেতু উইল বিকাম স্টার, মা। একবার শুধু নামটা হতে দাও, তখন দেখবে গ্রুপের ইনকাম! তুমি শুধু ঠ্যাং-এর ওপর ঠ্যাং তুলে নোটের বান্ডিল গুনে যাবে।

—যদি তেমন খ্যাতি না হয়? সব্বাই কি সমান উঠতে পারে? ভাগ্য বলেও তো একটা কথা আছে!

—তখন তুমি আছ। আমার ইটারনাল ব্যাঙ্ক।

—ব্যাঙ্কেরও তো আয়ু ফুরোবে। আমার রিয়াটারমেন্ট নেই?

—তার এখনও ঢের দেরি। তদ্দিনে একটা এসপার ওসপার করে ফেলব। হ্যাভ ফেথ অন মি, মা। আমি পারব। আগেও বলেছি, এখনও

বলছি, তোমার পতিদেবতার মুখে আমি ঝামা ঘসে দেব।

শেষ বাক্যটা উচ্চারণ করার সময়ে গভীর বিতৃষ্ণা ফুটে ওঠে বাবানের মুখে। ওই বিতৃষ্ণাই কি বাবানের চালিকাশক্তি? হবে হয়তো। বিরাগ বিতৃষ্ণারাও তো কোনও না কোনও অভিমুখে ঠেলে মানুষকে। সুখী ঘরকন্নার স্বপ্ন দেখা সুদীপা রায় যে আজ ঘরে বাইরে উদয়াস্ত পরিশ্রম করা নীরস সুদীপা সিন্‌হায় পরিণত হয়েছে, তার মূলেও তো রয়েছে ওই সব অনুভূতিই।

—কী গো, বসে বসে কী ধ্যান করছ?

সুদীপা নড়ে উঠল। স্নান সেরে বেশ তাজা হয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছে বাবান। পরনে শর্টস, টি শার্ট।

আলগোছে হাসল সুদীপা—ধ্যান নয়, ভাবছি।

—কী ভাবছ?

—লক্ষ্মী তো দেখছি আজ ডুব মারল। এখন আমাকেই রান্নাঘরে ঢুকতে হবে।

—ভালই তো। ধরো হাতা খুন্তি। মনটা একটু অন্য দিকে যাক।

—এ কথা বললি কেন? সুদীপা চোখ ঘোরাল, কোন দিকে আছে আমার মন?

—জানো না? বাবান মুখ টিপে হাসছে, দু দিন ধরে তো শোকে মুহ্যমান হয়ে আছ?

—যাহ্।

—যাঃ বললেই হল? আমার কি চোখ নেই? দেখতে পাই না?

—আহা, লোকটার ওরকম ক্রিটিকাল অবস্থা, আর আমি ধেই ধেই করে নাচব?

—ফ্র্যাংকলি স্পিকিং, নাচাই উচিত। তবে তুমি তা পারবে না, মা। বাবান চেয়ার টেনে বসল, পুছো কিঁউ?

—কেন?

—বিকজ ইউ আর স্টিল ইন লাভ উইথ দ্যাট পারসন। হাত

বাড়িয়ে সুদীপার থুতনিটা নেড়ে দিল বাবান, ঘাটিয়া পতিকা পেয়ারমে ফাঁসি হুয়ি টিপিকাল ভারতীয় আওরত।

—হুঁহ, মাকে খুব চিনেছিস। ...একসঙ্গে থাকলে কুকুর বেড়ালের ওপরও তো মায়া পড়ে।

—ভুল উপমা। মিস্টার সিন্‌হা যদি কখনও জানতে পারে তাকে কুকুর বেড়াল বলেছ, ফিরে এসে তোমার ছাল তুলে নেবে। সুদীপা হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই উঠে গিয়ে ফ্রিজ খুলছে। বলল, ডিম আছে পাঁচ ছটা। প্লেন ডিমের ঝোল ভাত করে ফেলি?

—লাগাও যা খুশি। চটপট। আমায় কিন্তু এগারোটার মধ্যে বেরোতে হবে।

টেবিল থেকে কাপ প্লেট তুলে সুদীপা রান্নাঘরে এল। গ্যাসে ডিম আলু সেদ্ধ আর ভাত পাশাপাশি বসিয়ে, মেজে ফেলল বাসনকটা। মশলাপাতি গুছিয়ে রেখে খোসা ছাড়াচ্ছে আলু ডিমের। তাকেও বেলায় একবার বেরোতে হবে। কাল ছুটি, আজ একবার ব্যাঙ্কে না গেলে নয়। মাত্র একদিনে উনিশ হাজার মতো বিল হয়েছে নার্সিংহোমে। কাল বিকেল পর্যন্ত পাওয়া হিসেব। গতকাল পনেরো হাজার তুলেছিল, আজ ওঠাবে আরও পনেরো। কত পড়ে থাকবে আর? খুব বেশি হলে হাজার আট দশ। সতেরো বছর চাকরি করে এই তো সঞ্চয়। তাও পাশ বইয়ের অঙ্ক বাঁদর আর তৈলাক্ত বাঁশ, এই ওঠে তো এই নামে।

কী করে জমাবে? যেই না সুদীপা চাকরিতে ঢুকল, ক্রোধে অন্ধ হয়ে সংসারে একটা কানাকড়ি দেওয়াও বন্ধ করে দিল চন্দন। চালাও সংসার, দেখি কত তেল! বছরখানেক পর থেকে মাসকাবারি আর কাঁচা বাজারটা আরম্ভ করল আবার। ছেলের স্কুল কলেজের মাইনেও দিয়ে গেছে বরাবর। কিন্তু ওই টুকুই। টেলিফোন ইলেকট্রিসিটি গ্যাস কাজের লোকদের মাইনে আজও সুদীপার ঘাড়ে। বাবু ফ্ল্যাট কিনে দেবেন, দামি দামি গ্যাজেটে ভরিয়ে দিচ্ছেন বাড়ি, কিন্তু সংসারে...? সেই ভয়, যদি টাকাপয়সা জমিয়ে কেটে পড়ে সুদীপা!

আমার বই.কম
amarboi.com

জেদ সুদীপারও আছে। যত চাপই আসুক, চন্দনের কাছে সে হাত পাতবে না। মাইনে হয়তো বেড়েছে, খরচও তো চড়ছে তালে তালে। এখন মাকেও কিছু দিতে হয় মাসে মাসে, ছেলের পকেটমানি আছে, নিজেও। এর সঙ্গে সামাজিক লোকলৌকিকতা তো লেগেই থাকে। আজ এর বিয়ে, কাল ওর অন্নপ্রাশন...। চন্দন কোথাও যাবেও না, দেবেও না। এর পরও যে আদৌ টাকা আছে ব্যাঙ্কে, এই না কত!

কিন্তু এখন কী হবে? সুদীপার ভাঁড়ার তো ফুরিয়ে এল। সংকট কাটলেও চন্দনকে নিশ্চয়ই রাখবে দিন পনেরো। কী ভাবে সামাল দেবে বোঝাটা? চন্দন একটু সুস্থ হলেই, যে চেকবই সে কখনও ছুঁয়েও দেখেনি সেটা নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দেবে নার্সিংহোমে? বলবে সই করে দাও? তোমার চিকিৎসার ব্যয় তুমিই সামলাও? ছি, সুদীপা কি অত নীচে নামতে পারে? বরং না বলাটাই তো চন্দনকে থাপ্পড় মারা। রমেনদা কালও টাকা দিতে চাইছিল। নেবে? সেও তো ধার। তার চেয়ে একটা পি-এফ লোনের দরখাস্ত ঠুকে দেওয়া ভাল। পেতে দিন দশ বারো লাগবে। টাকাটা হাতে এলে শ্যামল সেনদের পাওনাগণ্ডা মেটাতে হবে আগে। আপাতত কটা দিনের জন্য নয় রমেনদার থেকেই...। তেমন হলে ছোড়দিরাও আছে।

মনে মনে একটা সমাধান তৈরি করে সুদীপা খনিকটা নিশ্চিন্ত যেন। মন দিয়েছে কাজে। দু দিন বৃষ্টির পর আজ রোদ উঠেছে চড়া, এখনই গরম লাগছে বেশ। একটা মাত্র পদ, তাই রাঁধতে রান্নাঘরে ঘেমে নেয়ে একসা। ডিমের ঝোল কড়াতে রেখেই সুদীপা নেমে পড়ল টুকটাক গৃহকর্মে। ঝাড়াঝুড়ি করল ঘরদোর, জামাকাপড় ঢুকিয়ে চালু করল ওয়াশিং মেশিন। স্নান সারল। বেরিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে, ড্রয়িংহলে কলিংবেলের ডিং ডং। দরজা খুলেই সুদীপার চোখ বড় বড়। মা! সঙ্গে তুলতুলি। মেয়েকে দেখামাত্র সুপ্রীতি ডুকরে উঠলেন, এ তোর কী সর্বনাশ হল রে, দীপু...! তোর কপালে এও লেখা ছিল...!

সুদীপা হতবাক। চন্দনের খবর মা'র কানে পৌঁছোনোর তো কথা

নয়!

ধীরে ধীরে উদ্ধার হল রহস্যটা। কিছুটা তুলতুলির কলকলানি থেকে। কিছুটা সুপ্রীতির হাহুতাশে। ছোট মেয়ে দিনে একবার অন্তত মাকে ফোন করে, পরশু থেকে তার সাড়াশব্দ নেই, মেজ মেয়ে কাল স্কুল থেকে এসেই দুদ্দাড়িয়ে ছুটল কোথায়, ফিরল যখন সঙ্গে তার জামাই আর বড় মেয়ে, চাপা গলায় কী যে বলাবলি করছিল তারা...। বাতাসে গন্ধ শুঁকেই অঘটনের আঁচ পেয়েছিলেন সুপ্রীতি। আজ সকালে জেরা করে করে মেজ মেয়ের পেট থেকে বার করেছেন সংবাদটা। তার পরই আকুলি বিকুলি কান্না, ওরে তোরা আমাকে এক্ষুনি দীপুর কাছে নিয়ে চল...

চোখ ঘুরিয়ে তুলতুলি বলল,—কত বার বললাম ফোনে মাসিমণির সঙ্গে কথা বলে নাও, কেন অনর্থক ছোটাছুটি করবে...

সুদীপা বলল,—সেটাই তো উচিত ছিল। এই শরীর নিয়ে আসা...

—তোমার মা সে কথা শুনলে তো। গোঁ একবার যখন চেপেছে তখন তাকে রোখে কে। অবিরাম পিনপিন করছে, মেয়েটা আমার একা পড়ে আছে... বিপদের দিনে মা হয়ে পাশে গিয়ে একবার দাঁড়াব না! বলতে বলতে বাবানের দিকে ফিরেছে তুলতুলি,—বুঝলি তো, দিম্মা এখনও তোকে একটা আস্ত মানুষ বলে মনে করে না। হিসেবেই ধরে না তোকে।

—আমাকে কেই বা হিসেবের মধ্যে ধরে! বাবান টেরচা চোখে একবার দেখে নিল সুদীপাকে। তারপর হাসিমুখেই তুলতুলিকে বলল,—তা তুই তো একটা ফোন করে আসবি। আমরা তো এখন নাও থাকতে পারতাম।

—ফোনে তোদের লাইন পাওয়া গেলে তো। ডায়াল করে করে আঙুলে কড়া পড়ে গেছে। সারাক্ষণ কার সঙ্গে এত আড্ডা মারিস, হ্যাঁ?

—ও হ্যাঁ...টিটোর ফোন এসেছিল বটে। বহুৎ ব্যাকব্যাক করছিল ব্যাটা।

আমার বই কম
amarboi.com

—টিটো, না টিটি? দুটো ছেলে তো ফোনে অতক্ষণ গপ্পো করতে পারে না সোনা।

—তোর তো হেভি এক্সপিরিয়েন্স। বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে লাগাতার সংলাপ চালিয়ে যাস বুঝি?

ভাইবোনে খুনসুটি চলছে। সুদীপা মাকে নিয়ে বসল সোফায়। বলল—ইশ, হাঁপাচ্ছ তো এখনও। জল খাবে?

—দে একটু। তিনতলা ওঠা কি সোজা কাজ! কোমরের ব্যথাটাও কাল থেকে যা বেড়েছে...

—ওষুধ খেয়েছ?

—লেখা একটা ব্যথার বড়ি দিয়েছিল সকালে। তার জোরেই তো কোনও মতে...

বাবান জল এনে দিয়েছে। কাঁপা কাঁপা হাতে গ্লাসটা ধরেছেন সুপ্রীতি। চুমুক দিচ্ছেন, থেমে থেমে। সুদীপা একদৃষ্টে মাকে দেখছিল। চেহারাটা বড় ভেঙে গেছে মার। ফর্সা রং তামাটে, গালে কপালে ঘন আঁকিবুকি। কত বয়স হল মার? চুয়াত্তর? দেখে মনে হয় আশিরও বেশি। ব্লাড সুগারের সমস্যা তো আছেই, চোখেও ভাল দেখে না, ইদানীং হার্টেও একটা গোলমাল ধরা পড়েছে। তবু তার মধ্যেও ছুটে এসেছে তো! অবশ্য ছোট মেয়েকে নিয়ে মার বরাবরই দুশ্চিন্তা। ওই তেএঁটে জামাইয়ের সঙ্গে কীভাবে আছে, কেমন আছে...! আহা এ বেচারা শোকাতাপা মানুষটা, কদিনই বা বাঁচবে...!

সুদীপা নরম গলায় বলল—একটা কথা বলব, মা?

—কী রে?

—কষ্ট করে যখন এলেই, কটা দিন থেকে যাও না।

মেয়ের অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে একটু যেন কেঁপে উঠলেন সুপ্রীতি। স্বামী মারা যাওয়ার পর বড় দুই মেয়ের কাছে পালা করে থাকেন তিনি। কখনও এ বাড়িতে রাত্রিবাস করেন নি। সুদীপাও ভরসা পায় না রাখতে...চন্দনবাবু কখন দুম করে কী বলে বসে! সুদীপার বাবা মার

ওপর এখনও একটা বিজাতীয় আক্রোশ পুষে রেখেছে চন্দন।

বাবান বলল—থাকো না দিদা!

—থাকব?

—হ্যাঁঅ্যা। এখন তো ইজিলি থাকতে পারো। বাবান ফিচেল হাসল, গাঁইগুঁই কোরো না। চান্স পেয়েছ, কদিন ছোট কন্যার আদরযত্ন খেয়ে নাও।

সুপ্রীতি চোখ পিটপিট করছেন। বুঝি বা ঈষৎ আহ্লাদিত। বললেন—কিন্তু আমার ওষুধপত্র, জামাকাপড়...

—ধুৎ, ওটা কোনও প্রবলেম নাকি?

—ওরে তুলি, কী করব?

—থাকো। বডি ফেলে দাও। তুলতুলি হাসছে ফিকফিক, শুধু একটাই সমস্যা, তোমাকে হয়তো বাবানের গান শুনতে হবে। হেই ফুচকাঅলা, তোমার ঘেমো হাতে মাখো চুড়মুড়...

—ফালতু বকিস না। লোকে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে ওই গানই শুনতে আসে।

আমার বই . কম
amarboi.com

—সে তো লোকে মেলাতেও পয়সা দিয়ে দু মুখো চারপেয়ে মানুষ দেখতে যায়।

—অ্যাই তুলি, ইনসাল্টিং কমেন্ট করবি না। গানের তুই বুঝিস কী?

—কোনটা গান নয় এইটুকু তো বুঝি।

ভাই বোনে ফের খুনসুটি বেধে গেছে। তুলতুলি টুকুস টুকুস চিমটি কাটছে, খেপে যাচ্ছে বাবান। সুদীপা হাসিমুখে থামাল, কী রে বাবান, তুই না বেরোবি বলছিলি?

বাবানের হুঁশ ফিরল, তাই তো। পৌনে এগারোটা বাজে! ভাত বাড়ো। ভাত বাড়ো। জলদি। জলদি।

—টেবিলে গিয়ে বোস। আনছি।

সুদীপা উঠে রান্নাঘরে এল। ভাতের পাতে বাবান কাঁচা পেঁয়াজ

ভালবাসে, ছুরি দিয়ে কাটছে পেঁয়াজ। তুলতুলি আর মা'র জন্য আর একটু কিছু রান্না করতে হবে। ডিমের ডালনা বেশি করেই করেছে, সঙ্গে ডাল আলু ভাজা করে দিলেও হয়। আর একটু টোম্যাটোর চাটনি। তুলতুলি আর মাকে রেখে ব্যাঙ্কটা সেরে আসবে। তখন নয় খানিকটা মিষ্টি দইও...

দরজায় ছায়া। সুদীপা ঘাড় ঘোরাল। মা।

—কী হল? উঠে এলে কেন?

—দীপু, একটা সত্যি কথা বলবি?

—কী?

—লেখারা তো কেউ ভাল করে ঝেড়ে কাশল না। বাবানকে জিজ্ঞেস করছি, সেও তো ফাজলামো করে উড়িয়ে দিচ্ছে। ...তুই অন্তত বল।

—কীইইই?

—হ্যাঁ রে, বিপদ কেটেছে তো?

চট করে জবাব এল না সুদীপার মুখে। কোনটা বিপদ? চন্দনের মরে যাওয়া? না বেঁচে থাকা।

৪

আমার বই . কম

আজই দুপুরে বেড়ে দিল চন্দনকে। টানা দু দিন সংকটকালীন শয্যায় রাখার পর। তার অবস্থা এখন উন্নতির দিকে, সব ঠিকঠাক চললে হয়তো বা দিন আট দশের মধ্যে ছেড়ে দেবে ডাক্তার।

নার্সিংহোমে আজ অনেকেই এসেছে। সুদীপার দিদি জামাইবাবুরা, বোনঝি বোনঝির বর, শ্যামল ছাড়াও চন্দনের অফিসের আরও দু তিনজন। খানিক আগে চন্দনের দিদিও এল। সঙ্গে ছেলের বউ। চন্দনের এক খুড়তুতো ভাইও হাজির। দুজন দুজন করে যাচ্ছে ওপরে, দেখে আসছে রোগীকে। বেশিক্ষণ অবশ্য থাকছে না কেউ, বড়জোর দু পাঁচ মিনিট। চন্দনের সামনে এখন বেশি কথা বলাও বারণ।

সুদীপা ক্যান্টিনের বাইরেটায় দাঁড়িয়ে। পাশে দিদি আর অমিতদা। কাল ট্যুর থেকে ফিরেছে অমিত, নার্সিংহোমে আজ এই প্রথম এল। তিনজনে আজ এই প্রথম এল। তিনজনে কথা বলছিল টুকটাক।

চন্দনকে নিয়েই।

ক্যান্টিনের কর্মচারী চা দিয়ে গেল। প্লাস্টিকগ্লাসে হালকা চুমুক দিয়ে অমিত বলল—জানেন দিদি, রাউরকেল্লার হোটেলে লেখার ফোনটা পেয়েই আমার প্রথম কী রিঅ্যাকশান হয়েছিল?

—কী?

—দীপু ওর বরের সম্পর্কে চিরকাল আমাদের ভাঁওতা মেরে এসেছে।

সুদীপা বলল—আমি? ভাঁওতা?

—নয় তো কী? আরে বাবা, হার্ট অ্যাটাক কাদের হয়?

—কাদের?

—যাদের হার্ট থাকে। হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া চন্দন সিংহ কিন্তু প্রমাণ করিয়া দিল সে মোটেই হৃদয়হীন নহে।

—ফাজলামি মারবেন না। ভাল্লাগে না। সুদীপার চোখে ধুম কোপ, আমিই বুঝি শুধু চন্দনের নিন্দে গেয়ে বেড়িয়েছি? আপনারা বুঝি তার ব্যবহারের নমুনা পাননি?

—আহা, সে তো অনেক অভদ্র লোকেরও বড়সড় দিল থাকে। চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে বটে, কিন্তু অন্যের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। অমিত চোখ টিপল, ইনফ্যাক্ট, তোমার জন্য সে দু চার বার তার ট্রাইও নিয়েছে।

সুদীপা নাক কুঁচকোল, হুঁহ্, যত সব সস্তা মেলোড্রামা! যাদের আত্মহত্যার ইচ্ছে হয়, তারা ওরকম এই করলাম, এই করলাম বলে ঘোষণা করে না।

—আমার কী মনে হয় জানিস দীপু? সুমনা বড় বাস্কেটটায় চায়ের কাপ ফেলল, চন্দন একেবারেই সাইকিক। ওর আচরণে অন্যের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেটা ভাবারই ক্ষমতা নেই ওর। তোর অনেক আগেই ধরে বেঁধে ওকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

সুদীপা চুপ করে রইল। সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানোর কথা কি সুদীপার মাথায় আসে নি? দিদিরা তো জানে। সুদীপাই বলেছে। বদ্ধ উন্মাদ হলে ধরে বেঁধে তার চিকিৎসা করানো যায়, সেয়ানা পাগলদের মনোবিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাওয়া কী যে কঠিন! চন্দনের ক্ষেত্রে তো অসম্ভব। ঝগড়ার সময়ে এক দু বার মুখ ফসকে বলেও ফেলেছে সুদীপা, তুমি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাও, ওষুধ না খেলে তোমার মনের প্যাঁচ খুলবে না...। সঙ্গে সঙ্গে চন্দনের কী দাপাদাপি, আমায় পাগল প্রতিপন্ন করতে চাও, এত বড় আস্পর্ধা! তুমি যাও ডাক্তারের কাছে, তুমি তুমি তুমি...!

লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে ইতিউতি তাকাচ্ছে চন্দনের দিদি। সুদীপাকে দেখতে পেয়ে লন পেরিয়ে আসছে এদিকে। পিছন পিছন পিনাকী, চন্দনের খুড়তুতো ভাই। পলকের জন্য ঈষৎ আড়ষ্ট বোধ করল সুদীপা। এখানে দাঁড়িয়ে তারা আড্ডা মারছে বলে নন্দিতাদি আবার কিছু ভাবল না তো? পরক্ষণে নিজেকে শক্ত করল, ভাবলে বয়েই গেছে। চন্দন অসুস্থ বলে মুখে সব সময়ে দুখিনী যোগিনী পারা ভাব ফুটিয়ে রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার বই . কম
amarboi.com

সহজ পায়েই এগিয়ে গেল সুদীপা, কেমন দেখলে ভাইকে?

—জোর কাহিল হয়েছে। অত গাঁকগাঁক গলা, এখন স্বরই বেরোচ্ছে না।

—হুঁ।

—কতবার বলেছি রাগটা কমা, কথায় কথায় উত্তেজিত হোস না...। নন্দিতা একটা শ্বাস ফেলল, শুনলে তো কারুর কথা।

—রাগ নয়, বলো ভীমরাগ। পিনাকী বলে উঠল, সেই ছোট থেকেই দেখছি তো। পাড়ার ফুটবলে গোলকিপিং করত চাঁদুদা, যেই গোল খেল ওমনি বল নিয়ে পগার পার। কেউ ধরতে গেলে তাকে ঘুঁষি মারছে, লাথি চালাচ্ছে...। ধাতটা পেয়েছে পুরো জ্যাঠামশায়ের।

—দ্যাখ, এবার যদি শিক্ষা হয়। বড় একখানা ধাক্কা খেল তো!

সুদীপা ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল—রাগ গেলে তোমার ভাইয়ের থাকবে কী দিদি!

—তা অবশ্য ঠিক। এই বয়সে স্বভাব কি আর পালটায়। নন্দিতা আবার একটা শ্বাস ফেলল, তোমাকেই একটু সমঝে বুঝে চলতে হবে। এখন খুব সাবধানে রাখা দরকার।

সুদীপা যেন জানে না। এসব আলগা পিরিতের কথা শুনলে সুদীপার পিত্তি জ্বলে যায়। তবে তার ননদ মানুষটা সাদামাটা, সাতে পাঁচে থাকে না, নিজের সংসার নিয়েই মশগুল। ভাইয়ের পক্ষ নিয়ে সুদীপার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগও হানেনি কখনও। নেহাত বলতে হয় বলেই বোধহয় বলা। সুদীপা জানে।

আলগাভাবে কথাটা এড়িয়ে গেল সুদীপা—তোমরা কি এখনই চলে যাচ্ছ?

—আজ যাই। মন্টুর ছেলেটাকে তোমার নন্দাই-এর কাছে রেখে এসেছি। যা দুরন্ত, দাদু এতক্ষণে নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে। জয়াও খুব ছটফট করছে।

—জয়া গিয়েছিল ওপরে? মামাশ্বশুরকে দেখে এল?

—হ্যাঁ। ও নামার পরেই তো তোমার মেজদির মেয়ে জামাই উঠল।...এর মধ্যে আমি হয়তো আর আসতে পারব না। মন্টু আসবে।

নন্দিতারা চলে যাওয়ার পর একাই লাউঞ্জে ফিরল সুদীপা। গতকাল রবিবার গেছে, কালকের তুলনায় লাউঞ্জে আজ ভিড় কমই। বাচ্চা কাচ্চাও নেই, হুটোপুটি চ্যাঁ ভ্যাঁর আওয়াজও হচ্ছে না। জায়গাটা ভারী শান্ত লাগছে আজ। যান্ত্রিক হিমেল বাতাসের গুণে বেশ আরামদায়কও।

চেয়ারে বুলবুলি আর ছোড়দি। মা মেয়ে নিবিষ্ট আলাপে মগ্ন।

সুদীপা তাদের সামনে এল—কী রে বুলবুলি, তোরা যে বড় এর মধ্যেই নেমে এলি?

—বেশিক্ষণ আর কী থাকব! বুলবুলি হাত উলটোল, শুভ্রাংশু

জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন ছোটমেসো? বলল, ভাল। বলেই চোখ বুজে ফেলল। আমরাও...

সুদীপা হেসে ফেলল, এখন দর্শনার্থী কারা?

—অফিসের লোক। ওই যে, শ্যামলবাবু না কী নাম...

—ও। ...শুভ্রাংশু গেল কোথায়?

—এখানকার মেডিসিন শপে। বড়মেসোর শাকরেদ হয়েছে।

—আবার ওষুধের স্লিপ ধরাল?

—দিল তো। শুভ্রাংশু নার্সদের কাছে খোঁজ নিতেই...

—ও।

সুদীপা ছোড়দির পাশে বসল। বুলবুলি ঘাড় হেলিয়ে জিজ্ঞেস করল—মাসিমণি, বাবান এল না?

—না রে। খুব টায়ার্ড। শ্রীরামপুরে প্রোগ্রাম করে কাল রাত একটায় ফিরেছে। আজ সারাদিন রেস্ট নেবে বলছিল। তাছাড়া জানিসই তো, এই সব নার্সিংহোম টার্সিংহোম ও একদম পছন্দ করছে না।

আমার বই.কম
amarboi.com

সুলেখা বলল, আমাকেও বলছিল, রোজ রোজ তোমাদের কেত্তনপার্টির মতো দল বেঁধে যাওয়ারই বা দরকার কী!

বাবান উপমাও খুঁজে বার করে বটে। সুদীপার ঠোঁটে চিলতে হাসি উঁকি দিয়েও মিলিয়ে গেল। হালকা ভাবে টাকার চিন্তা ফিরছে মাথায়। কাল সাড়ে নশো পড়েছিল ওষুধে, আজ কত পড়বে কে জানে! খানিক আগে বিল মিটিয়েছে আজ। দেওয়া ছিল উনিশ হাজার, আজ দিল আরও সতেরো। এত কী করে হচ্ছে? এরা কি রোজই গাদাগুচ্ছের টেস্ট করায়? বিলগুলো সব একসঙ্গে রাখতে হবে, ফাইনাল পেমেন্টের সময়ে লাগবে। আজকেরটা কোথায়? রমেনদার কাছে? উঁহু, রমেনদা দেখে ফেরত দিয়ে দিল না! সুদীপা ব্যাগ খুলল। উফ, রাশিরাশি কাগজ: বেশির ভাগই অদরকারি। আজেবাজে। খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা কী যে ঝকমারি! নাহ্, আজ রাত্রেই সাফ করতে হবে ব্যাগের জঞ্জাল।

সুলেখা ঝুঁকেছে, কী খুঁজছিস রে?

—এখানকার রিসিটটা। কোথায় যে রাখলাম!

—একটা ফাইল করিস নি কেন? সব কিছু একসঙ্গে থাকে।

—হুম। করতে হবে।

বলতে বলতে সুদীপা পেয়ে গেল কাগজটা। খুলে ক্ষণিক দেখে নিয়ে ব্যাগের ছোট খাপটায় রাখল সন্তর্পণে।

টাকার অঙ্কটা সুলেখার নজর এড়ায় নি। ঈষৎ ত্রস্ত মুখে বলল—মিটার তো চড়চড়িয়ে উঠছে রে!

—এ তো একটা পার্ট। ওষুধ ইনজেকশান আলাদা। সেও না হোক আট হাজার ছাড়াল।

—সত্যি, ভাল জায়গায় রাখা মানে হাতি পোষার খরচ।

—তাই তো দেখছি। ব্যাঙ্ক থেকে তিরিশ তুলেছিলাম, রমেনদা দিল পঁচিশ, এর মধ্যে পঁয়তাল্লিশ হাজার অলরেডি গন। সুদীপা মাথা ঝাঁকাল, যাক গে। দুপুরে আজ পি-এফের অ্যাপ্লিকেশান দিয়ে এসেছি। ওরা তো বলছে সপ্তাহখানেকের মধ্যে করে দেবে।

—কত তুলছিস?

—পঞ্চাশ। ...মনে হচ্ছে ওতেই সামাল দেওয়া যাবে।

—দেখলি তো, চাকরিটা কত কাজে লাগে! এই যে সামাল দেওয়ার কথাটা বলতে পারছিস...।

বটেই তো। চাকরিটা তার নেই, এ কথা ভাবলে এখন সুদীপার বুক হিম হয়ে আসে। অথচ একটা সময়ে এই সুদীপাই কাজে বেরোনোর কথা স্বপ্নেও ভাবে নি। ছোড়দিই তাকে ধাক্কা দিয়েছে বারবার। বাবান হওয়ার আগেই বলত, বয়স থাকতে থাকতে নিজের পায়ে দাঁড়া, দীপু...। প্রথম দিকে সুদীপা ততটা গা করেনি। কিছুটা আলস্যে, অনেকটাই ভয়ে। বাইরের দুনিয়াকে ভয়। দাপুটে শ্বশুরকে ভয়। সব চেয়ে বেশি ভয় চন্দনকে। চাকরির নাম শুনলে সে আবার কী অনর্থ বাধিয়ে বসে! বাবান জন্মানোর পর বছর খানেক বুঝি মূর্তিটা একটু নরম সরম ছিল চন্দনের। তবে যার ভেতরে নোংরা কীটটা আসন গেড়ে বসে আছে কতদিন সে সুস্থির থাকবে! সন্দেহ এমন অসুখ যার ব্যাকটেরিয়া নিঃসাড়ে বংশবিস্তার করে। পরিবেশ যেমনই হোক, কারণ থাকুক চাই না থাকুক। শ্বশুরমশাই গত হওয়ার পর চন্দন বনে গেল সংসারের অধীশ্বর। কী তার তেজ তখন! ইচ্ছে মতো অশ্লীল মন্তব্য করে যাবে, সুদীপা প্রতিবাদ জুড়লেই সঙ্গে সঙ্গে হুংকার, ঘেঁটি ধরে বার করে দেব! রসের নাগর তোমার বড় জামাইবাবুটি কী মারাতে এসেছিল এ বাড়িতে! হারামজাদার হাত তো দেখি তোমার কাঁধ ছেড়ে নড়ে না! খুব সুখ পাও, অ্যাঁ! আমারই খাবে, আমারই পরবে, আর আমার ঘরে বসে লীলাখেলা চালাবে, এ আমি বরদাস্ত করব না...!

ভাগ্যিস, তখনই জেদটা চেপেছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে টাইপ প্র্যাকটিস, অ্যাপ্লিকেশান ছাড়া, পরীক্ষায় বসা...কত খেটেখুটে ঊনত্রিশ বছর বয়সে চাকরি। দেরি হলেও নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো একটা জায়গা। ওটুকু না থাকলে সুদীপা বুঝি অ্যাদ্দিনে অন্ধকূপে দম আটকে মরেই যেত।

অফিসের লোকদের দর্শন শেষ। নেমে এসেছে। ফিরল রমেনদারাও। শ্যামল সেন দাঁড়িয়ে কথা বলল একটুক্ষণ, সদলবলে চলেও গেল।

আমার বই কম
amarboi.com

ওষুধের প্যাকেটটা সুদীপার হাতে ধরিয়ে রমেন বলল—যা, এবার তুই লাস্ট মিনিট অ্যাপিয়ারেন্সটা দিয়ে আয়।

সুদীপা হেসে বলল—আমি একা কেন, আপনিও চলুন।

—আজ থাক।

—কেন?

—আজ সবে বেচারা আই-সি-ইউ থেকে বেরোল। এত ধকল কি সহ্য হবে?

—আহা, এত লোক ঘুরে এল তাতে যদি কিছু না হয়ে থাকে...

—আমি তো স্পেশাল কেস। ছাপ মারা ক্রিমিনাল। আমায় দেখলে টেনশান হতে পারে!

—হোক। অমিতদাও তো ঘুরে এল!

—সেই জন্যই তো বলছি। একদিনে বেশি প্রেশার বেচারাকে না দেওয়াই ভাল। তারচেয়ে বরং একদিন অমিত যাবে, একদিন আমি যাব...। সইয়ে নিতে হবে না?

হো হো করে হেসে উঠেছে সবাই। বুলবুলি সুলেখা তো বটেই, শুভ্রাংশুও। সুদীপার একটু অস্বস্তিই হল। সত্যি, কী একখানা ভাবমূর্তি তৈরি করে রেখেছে চন্দন!

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে আসছে। রমেন আর সুলেখার তাড়া খেয়ে লিফটের দিকে পা বাড়াল সুদীপা।

দু শয্যার কেবিন। ঝকঝকে। সবুজ পরদা টেনে পৃথক করা হয়েছে দুই রোগীকে। ওপাশের বেডে ভিজিটার আছে এখনও। গলা শোনা যায়।

চন্দন দরজার দিকেই তাকিয়েছিল। সুদীপার অপেক্ষাতেই ছিল কি?

সুদীপা বিছানার পাশে রাখা টুলটাতে বসল। একটু যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে চন্দনকে। মুখ শুকনো, চোখের কোল বসা বসা। তবু সুদীপা হাসি টেনে বলল—এই তো, অনেক ভাল হয়ে গেছে। চন্দন উত্তর দিল না। দেখছে সুদীপাকে।

সুদীপা জিজ্ঞেস করল—বুকের ভার ভার ভাবটা নেই তো?

—না।

—আজ একবারও অক্সিজেন লেগেছিল?

—না।

—শরীরে জোর পাচ্ছ?

—কী করে পাব? খেতে দিচ্ছে কিছু?

—সিস্টার যে বলল আজ চিকেন দিয়েছে।

—হ্যাহ্, চিকেন, না পিণ্ডি! গলা গলা, ঘ্যাঁট ঘ্যাঁট, আঁশটে গন্ধ... আলুনি...

—এক্ষুণি তো সলিড দেবে না...

—কেন?

—বোধহয় হজমের সুবিধের জন্য। গ্যাস ট্যাস ফর্ম করলে তো বুকে চাপ পড়বে। সে জন্য তো তেলমশলাও...। আর নুন তো এখন তোমার চলবেই না।

—ইটস টু মাচ। মুখ বিকৃত করল চন্দন। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল,—

—এখনও উঠে পর্যন্ত বসতে দিল না।

—দেবে। কাল পরশুর মধ্যেই হয়তো দেবে।

—আর কত দিন এখানে থাকতে হবে?

—কেন? তোমার কি কোনও অসুবিধে হচ্ছে? দিব্যি রেস্টে আছ, ডাক্তার সকাল বিকেল দেখছে।

চন্দন চুপ। কী যেন ভাবছে। হঠাৎই বলল—এখানে অনেক খরচ, না?

—তোমাকে ও নিয়ে ভাবতে হবে না। বেশি কথা না বলে চোখ বুজে থাকো তো।

আমার বই কম
amarboi.com

তবু চন্দন বিড়বিড় করে চলেছে, সেন বলছিল তুমি নাকি ওদের টাকাটা দিয়ে দিয়েছ?

—আহ, ছাড়ো না ওসব কথা। চুপ করে শোও।

চন্দন চোখ বুজল, কিন্তু কথা থামাল না। আপন মনে বলে চলেছে, কোনও প্রয়োজন ছিল না। ওটা কমন ফান্ডের টাকা। আমাদেরই তৈরি। এমারজেন্সি পারপাসে কাজে লাগানোর জন্যে।

—জানি। শ্যামলবাবু বলেছেন।

—তাহলে তাড়াহুড়ো করলে কেন?

—আহা, শোধ তো করতেই হত। আজ নয় কাল।

—সে তো আমি করতাম।

সুদীপা রা কাড়ল না। কথা বাড়াতে সে রাজি নয়।

ঝট করে চোখ খুলল চন্দন। চোখ টেরচা করে দেখছে সুদীপাকে। ফ্যাসফেসে গলায় বলল, তোমার অনেক টাকা হয়েছে, না? তলে তলে অনেক জমিয়েছ?

সুদীপা চোখ সরিয়ে নিল। কী উত্তর দেবে? উত্তর কি হয়?

—তোমার ঋণ আমি রাখব না। চন্দনের ঠোঁট ঈষৎ বেঁকে গেল। হাঁপাচ্ছে। হিসহিসিয়ে বলে উঠল, একবার এখান থেকে বেরোতে দাও, তোমার প্রতিটি পাই পয়সা আমি গুনে গুনে শোধ করে দেব।

নাহ্, আর বসে থাকার মানেই হয় না। লোকটা মিছিমিছি আরও উত্তেজিত হবে।

সুদীপা গলা নামিয়ে চলল, চলি। আজেবাজে চিন্তা ছেড়ে এবার একটু ঘুমোনোর চেষ্টা করো।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে একবার ঘুরে তাকাল সুদীপা। চন্দন স্থির তাকিয়ে। লিফটে ঢোকার পরেও সুদীপার গায়ে লেগে রইল দৃষ্টিটা।

৫

আমার বই . কম
amarboi.com

ঋণ শোধ করা হল না চন্দনের। ভোররাতে আচমকা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। আবার। পর পর দু বার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ভেন্টিলেটারে দেওয়া হয়েছিল, ডাক্তারি শাস্ত্র মতো চেষ্টাও চলছে ঘণ্টা তিনেক। সবই বিফল, সাড়া দিল না হৃদযন্ত্র।

টেলিফোন পেয়েই সুদীপা আর বাবান চলে এসেছিল। পৌঁছে গেছে সুদীপার দিদি জামাইবাবুরাও। তারপর ঠাণ্ডা নির্জন লাউঞ্জে বসে থমথমে প্রতীক্ষা, কখন ডাক পড়ে, কখন ডাক পড়ে। অন্তিম ঘোষণা শুনে সুদীপা কি ডুকরে উঠেছিল? না। শেল বিঁধেছিল তার বুকে? তাও না। অপার মুক্তির স্বাদ্ অনুভব করল? উঁহু, তাও তো নয়। কেমন একটা ভোঁতা ভার ভার ভাব শুধু ছড়িয়ে গেল বুকে। দুঃখ বা যন্ত্রণা নয়, এ যেন অন্য কিছু। কথা বলা পুতুলের মতো ঠোঁট নড়ল ডাক্তারের সামনে। কেজো বাক্য। সৌজন্যসংলাপ। আস্তে আস্তে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। আবার বসে আছে ঠায়। বুকে সেই ভোঁতা ভোঁতা চাপ।

দিন ফুটে গেছে অনেকক্ষণ। মেঘ মেঘ সকাল। মনমরা সকাল। দশটা প্রায় বাজে, খবর পেয়ে একে একে অনেকেই নার্সিংহোমে উপস্থিত

এখন। চন্দনের ভাগ্নে, ভাই, অফিসের সহকর্মী, বাবানের বন্ধুরা...। ঘোরাফেরা করছে ইতস্তত। আয়োজন চলছে চন্দনের শেষ যাত্রা।

বাবান পাশে এসে বসল—মা?

উঁ।

চলো। বাবাকে নামানো হয়েছে।

কত দিন পর ছেলের মুখে বাবা ডাকটা শুনল সুদীপা! বাবানের স্বরটাও যেন ঈষৎ ধরা ধরা। কেঁদেছে কি? ছেলের চোখ দেখে সুদীপা বুঝতে পারল না। ছুঁল ছেলেকে। তার বাহু ধরেই ছাড়ল চেয়ার।

একে কি জোর পাওয়া বলে? নাকি জোর দেওয়া? নাকি দুটোই? মৃত মানুষকে লোকজনের সামনে দিয়ে বার করা হয় না, সে বন্দোবস্ত নার্সিংহোমের পিছনে। টানা প্যাসেজ ধরে, চাতাল পেরিয়ে, সুদীপাকে হাঁটতে হল দীর্ঘ পথ। টানা চব্বিশটা বছর, কম রাস্তা তো নয়!

শববাহী শকট ঘিরে ছোট্ট ভিড়। মৃদু ব্যস্ততা। বাবানের বন্ধু ধূপ জ্বালাচ্ছে, গাড়িতে ধূপের গোছা গুঁজছে চন্দনের এক সহকর্মী। চন্দনের বুক অবধি চাদর, তার ওপরে ফুলের স্তবকগুলো সাজিয়ে দিল রমেনদা। খই-এর ঠোঙা হাতে ভুটকান শুভ্রাংশুকে কী যেন বলল। ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে অমিতদা আর মন্টু... টুকরো টুকরো ছবির মতো দৃশ্যগুলো ঝলক দেখল সুদীপা। পায়ে পায়ে এগোল সামনে।

এখন দৃশ্যপটে একটাই মুখ। চন্দন।

হিংসে সন্দেহ ক্রূরতা নীচতা হীনম্মন্যতা, সব কিছুর ঊর্ধে উঠে যাওয়া একটা মৃত মুখ।

খরখরে চোখে মুখটাকে দেখছিল সুদীপা। আশ্চর্য, টাইপস্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেই যুবকটিকেও হঠাৎ মনে পড়ে কেন? এই মুহূর্তের ঋণ কি শুধু চন্দনেরই রয়ে গেল? সুদীপার নেই?

চন্দন ক্রমে আবছা হয়ে যাচ্ছিল। ফুটে উঠছে এক ধূ ধূ প্রান্তর। ঘাসবিহীন।

হঠাৎ অরণ্যে

আমার বই . কম
amarboi.com

আমার বই ডট কম
amarboi.com

ছেলের পরীক্ষার পর কদিন কোথাও একটু বেড়িয়ে আসার জন্য অর্ণবকে খুব ধরেছিল মালবিকা। টুকুস যদিও ওয়ান থেকে টু-এ উঠবে, তবু তার পড়াশুনো নিয়ে মালবিকার টেনশান তো কম যায় না। ছেলের ঘেঁটি ধরে পড়তে বসাও রে, লেসন্‌স তৈরি করাও রে, সামস শেখাও রে...কম হ্যাপা! এর পর তো একটু মাথা ছাড়াতে ইচ্ছে করতেই পারে। তাছাড়া ফাল্গুন তো ফুরিয়ে এল, বৃথাই যাবে বসন্ত?

তা হুট বললেই কি অর্ণবের বেরনোর জো আছে! মাত্র আটত্রিশেই হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে বেশ নাম হয়েছে তার, দিনরাত হাসপাতাল নার্সিংহোম আর চেম্বারের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছে। সব দিক সামলে সুমলে অবসরের ফাঁকফোকর বার করা কি সোজা কাজ!

তবু তার মধ্যেই খানিকটা সময় ঠিক ম্যানেজ করে ফেলল অর্ণব। বেড়াতে সেও কম ভালবাসে না। বিশেষত জঙ্গলে। বন্দোবস্তও হল সেই মতো। শুক্রবার তাড়াতাড়ি চেম্বার সেরে চাপবে রাতের ট্রেনে, মঙ্গলবার সকালে প্রত্যাবর্তন। এত ছোট ট্রিপে বান্ধবগড় কি ন্যাশনাল

করবেট পার্ক তো সম্ভব নয়, কাছেপিঠে সিমলিপাল সারান্ডা বেতলাও ঘোরা হয়ে গেছে, এবার চলো সাতকোশিয়া।

মালবিকা আর অর্ণব তখন জানত না এবারের অরণ্যভ্রমণ একটু অন্যরকম হবে।

ট্রেন কটক পৌঁছেছিল ভোরবেলা। দিনের আলো সবে ফুটেছে তখন। কুলির মাথায় তল্পিতল্পা চাপিয়ে স্টেশনের বাইরে পা রাখতেই যথারীতি এক ঝাঁক ট্যাক্সিওয়ালা ছেঁকে ধরল অর্ণবকে। যেখানেই যাক, এই সব ড্রাইভার বেয়ারা কুলি চৌকিদার দারোয়ানরা কী ভাবে যেন টের পেয়ে যায় একজন শাঁসালো মক্কেল পেয়ে গেছে তারা। অথচ অর্ণব যে সর্বক্ষণ খুব স্যুটেড বুটেড থাকে তাও নয়, কলকাতার বাইরে বেরোলে তো শুধু জিনস্ আর টিশার্ট। আসলে অর্ণবের চেহারা আর হাঁটাচলায় একটা রাজকীয় ভাব আছে. তাকে দেখলেই এসব লোকগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

অর্ণবকে নিয়ে রীতিমত টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অর্ণব থামাল তাদের। দু হাত তুলে নাটুকে ঢঙে বলল,—শান্ত হও বাবা সকল। আমি তো সব কটা গাড়িতে একসঙ্গে উঠতে পারব না, একজনের সঙ্গেই যাব। তোমরা আগে পাঞ্জা লড়ে ঠিক করে নাও কে আমার সঙ্গে বাতচিত চালাবে।

ভাষণে কাজ হল। নিজেদের মধ্যে খানিক গুজগুজ ফুসফুসের পর এগিয়ে এল এক বছর তিরিশের যুবক। মুখচোখ চোয়াড়ে, তবে স্বর বিনীত,—আজ্ঞে বলুন স্যার।

—নাম কী তোমার?

—যুধিষ্ঠির, স্যার। যুধিষ্ঠির দাস।

—তা ভাই যুধিষ্ঠির, আমরা যাব সাতকোশিয়ার জঙ্গলে। চেনো তো?

—অবশ্যই। লাস্ট উইকেই একটা ট্রিপ করেছি। কলকাতারই পার্টি

ছিল। বাঙালিবাবু।

—গুড। এবার বলো দেখি, মালকড়ি কী নেবে? আজ কাল পরশু তিন দিন থাকব, পরশু রাত নটার মধ্যে ব্যাক টু কটক।

—আজ্ঞে ধরুন...। যুধিষ্ঠির ঘাড় চুলকোচ্ছে,—পার ডে বারোশো হিসেবে তিন দিনে ছত্রিশশো টংকা। আর দুটো নাইট হল্ট দেড়শো দেড়শো তিনশো।

—এখান থেকে সাতকোশিয়ার ডিসট্যান্স কত হে?

—তা ধরুন গিয়ে যাতায়াতে সাড়ে চারশো কিলোমিটার। তারপর জঙ্গলেও তো নিশ্চয়ই ঘুরবেন?

—নয় তো কি ঘরে শুয়ে থাকব! অর্ণব ভুরু নাচাল,—রেট যা বলছ...গাড়ি কি মার্সিডিজ নাকি?

—না স্যার, অ্যাম্বাসাডার। জঙ্গলে হার্ডি গাড়ি লাগে স্যার।

—বুঝলাম। তুমি আমার গলা কাটবে। কাটো, কাটো।

বেড়াতে বেরিয়ে দরদস্তুর করা অর্ণবের একদমই পোষায় না। কেনই বা করবে? ওতে কটা টাকাই বা সাশ্রয় হয়? দুটো পেশেন্টের ভিজিট, কি মেরেকেটে তিনটে! খরচ করার সামর্থ্য যখন আছে, মিছিমিছি লোকটাকে বঞ্চিত করবেই বা কেন। তার চেয়ে বরং এমনভাবে চলো, হাম ভি খুশ, ড্রাইভার খানসামা ভি খুশ।

বাকি ট্যাক্সিওয়ালারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে করতে কেটে পড়েছে গুটিগুটি। নির্ঘাত আফশোস করছে, জব্বর একটা মোরগা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল আজ।

যুধিষ্ঠিরের তখন বিগলিত দশা,—গাড়ি তাহলে লাগিয়ে দিই স্যার?

—এক সেকেন্ড। অর্ণবের র‍্যাগিং শুরু হয়েছে এবার। ফস করে বিদেশী সিগারেট ধরিয়েছে একখানা,—তোমার সঙ্গে আমার বনিবনা হবে কিনা সেটাও বুঝি নিই।

—বলুন স্যার?

আমার বই . কম
amarboi.com

—দ্যাখো, আমি কিন্তু একটু খামখেয়ালি আছি। জঙ্গলে যখন খুশি গাড়ি বের করতে বলতে পারি।

—সে তো বটেই স্যার। এত টাকা ভাড়া গুনছেন, সার্ভিস দেব না?

—ভেবেচিন্তে বলো কিন্তু। যখন তখন মানে যখন তখন। রাত দুটো হতে পারে, ভোর চারটে হতে পারে, কিম্বা ঠা ঠা দুপুর। এনি টাইম।

—ঠিক আছে স্যার। যুধিষ্ঠিরকে একটু যেন ম্রিয়মাণ দেখাল।

—ধরো ইচ্ছে হল রাত বারোটায় ওয়াচ টাওয়ারে যাব। সারা রাত হয়তো সেখানেই কাটালাম। তোমাকেও কিন্তু সঙ্গে থাকতে হবে। কাঁই কাঁই করলে চলবে না তখন।

—আপনি বললে তো থাকতেই হবে স্যার।

—তারপর ধরো আমার মেজাজ হুটহাট চড়ে যায়। তখন গালমন্দও করতে পারি। তুমি চটে যাবে না তো?

—না স্যার। কত ধরনের প্যাসেঞ্জার আমাদের দেখতে হয়। সবার সব কথা কি গায়ে মাখলে চলে?

—গুড। মাল টাল খাও?

যুধিষ্ঠির থতমত এবার। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

—কী হল, চুপ্পুটুপ্পু চলে? ধেনো টোনো?

—না স্যার। কক্ষনো না স্যার।

—খেলে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে আউট হয়ে পড়ে থাকবে, তোমায় ডেকে পাব না, এমন যেন না হয়।

—হবে না স্যার।

মালবিকার আর ভাল লাগছিল না। ট্রেন থেকে নেমে ইস্তক সেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, তার ওপর গায়ে ঢুলে ঢুলে পড়ছে টুকুস, এখন এই ধরনের র‍্যাগিং দেখা পোষায়? এত দিলদরিয়া মেজাজ অর্ণবের, কিন্তু এই সব ড্রাইভার টাইভারদের ওপর এক ধরনের মানসিক অত্যাচার

চালিয়ে কী যে সুখ পায়? খানিক বিরক্ত মুখেই মালবিকা বলল,—হয়েছে, হয়েছে, এবার মালটালগুলো গাড়িতে তোলার ব্যবস্থা করো।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যুধিষ্ঠির। দৌড়েছে গাড়ি আনতে।

বাইরে তখন এক প্রসন্ন ভোর। বসন্তের গন্ধ মাখা। নরম একটা বাতাস বইছিল। একটু বুঝি শীতলতার ছোঁয়া ছিল বাতাসে, মিঠে লাগছিল বেশ। ট্রেন থামায় ক্ষণিক ব্যস্ততা জেগেছিল স্টেশন চত্বরে, আবার যেন ঈষৎ ঝিম ধরা ভাব। চালকবিহীন রিক্সা অটো নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। দু পাঁচটা সদ্য ঘুম ভাঙা মানুষ দেখা যায় বটে, তবে তাদেরও যেন কোনও ব্যস্ততা নেই।

গাড়িতে ওঠার আগে মালবিকা বলল,—একটু চা খেয়ে রওনা দিলে হত না?

সঙ্গে সঙ্গে অর্ণব তাকাচ্ছে এদিক ওদিক,—এদিকে তো কোনও দোকান দেখছি না। প্ল্যাটফর্ম থেকে খেয়ে আসবে?

যুধিষ্ঠির স্টিয়ারিং-এ বসে তৈরি। চটপট বলল,—চলুন না স্যার, পাম্পে তেল নেব, ওখানে ভাল হোটেল আছে, চা পেয়ে যাবেন।

—তাই হোক। ...কী মিলু, চলবে তো?

—চলবে।

টুকুসকে নিয়ে পিছনের সিটে বসেছে মালবিকা। অর্ণব সামনে, যুধিষ্ঠিরের পাশে। গাড়িতে উঠেই টুকুসের ঢুলুনি গভীর ঘুমে রূপান্তরিত হয়েছে, মাথাটা কোলে নিয়ে তার পা দুখানা মালবিকা ভাল করে ছড়িয়ে দিল সিটে। আহা রে বেচারা, এত সাতসকালে তো ওঠার অভ্যেস নেই।

গাড়ি স্টার্ট দিতেই পকেট থেকে মোবাইল ফোনখানা বার করে দেখছিল অর্ণব। হাল্কা গলায় বলল,—এখনও সিগনাল আছে, বুঝলে।

—থাকা মানেই তো বিপদ। মালবিকা ফুট কাটল,—উল্টোপাল্টা কল আসবে।

—আরে না, সাতটা বাজলেই অফ করে দেব। তারপর তিনটে

দিন কলকাতা পুরো ভোকাট্টা। টেনশান থেকে মুক্তি।

অর্ণবের এই খুশি খুশি মুখখানা দেখতে বেশ লাগে মালবিকার। সত্যি, কলকাতায় বড্ড বেশি চাপে থাকে অর্ণব। সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট খেয়েই দৌড়, দুপুরে কোনও দিন খেতে এল তো ভাল, নইলে ফিরতে ফিরতে সেই রাত দশটা। তখনও নিস্তার নেই, মাঝে মাঝেই বেজে উঠছে মোবাইল। রাত বারোটার আগে শুতেই পারে না। যাও বা একটু চোখ বুজল, হঠাৎ আবার কল। এক একটা তো পিত্তি জ্বালানো। কোনও রোগিণীর স্বামী পরামর্শ চাইছেন, বউ-এর ঘুম আসছে না, তিনি কী করবেন! ডাক্তাররা যেন রক্তমাংসের মানুষ নয়, তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন নেই, ঘরবাড়ি নেই, মা বাবা বউ বাচ্চা নেই! ইদানীং তো মাঝেমাঝে ঘুমের বড়ি গিলতে হচ্ছে অর্ণবকে। ভাল্লাগে না।

গাড়ি মিনিট দশেকের মধ্যেই উঠে পড়েছে মহানদীর ব্রিজে। লম্বা সেতু, চলছে তো চলছেই। নীচে প্রবহমান প্রকাণ্ড নদীটার প্রায় গোটাটাই চড়া, দু প্রান্তে ক্ষীণ জলধারা। এই নদীই নাকি বর্ষাকালে ভয়ংকরী, ডুবিয়ে দেয় কটকের অর্ধেকভাগ।

অর্ণবকে ভুলে মালবিকা এবার নদীটাকে দেখছিল। বালুচরেরও একটা আলাদা শোভা আছে, দু চোখ টেনে রাখে। পাড়ে বাঁধা নৌকোগুলো যেন খেলনার মতন। দুলছে মৃদু মৃদু।

আপন মনে মালবিকা বলে উঠল,—কী অপূর্ব, তাই না?

অর্ণব ফিরে তাকাল,—চলো না, এই মহানদীকে তুমি আবার পাবে। সাতকোশিয়ার জঙ্গলের ধার দিয়েই নাকি মহানদী এসেছে। কী হে যুধিষ্ঠির, তাই তো?

—হ্যাঁ স্যার। টিকরপদার বাংলো একেবারে নদীর পাড়ে।

—ওয়াও! আমরা তো টিকরপদাতেই যাচ্ছি।

ব্রিজ পার হয়ে বাঁয়ে ঘুরল গাড়ি। সম্বলপুরের রাস্তা। জাতীয় রাজপথ। প্রকাণ্ড বোর্ডে জ্বলজ্বল করছে ঢেন্‌কানল, ন্যালকো নগর, আঙ্গুল আর সম্বলপুরের দূরত্ব। মিনিট কয়েকের মধ্যেই গাড়ি ঢুকেছে

একটা বড়সড় পাম্পে। পাশে হোটেল একটা ছিল বটে, কিন্তু তখনও তার ঝাঁপ ওঠেনি। উল্টোদিকে এক সিঙাড়া কচুরির দোকান, সেখানে সবে উনুনে আঁচ পড়ছে। মালবিকা তো বটেই, অর্ণবও হতাশ। অগত্যা ট্যাংকি ফুল করে চলো মুসাফির, বাঁধো গাঠরিয়া...

যুধিষ্ঠির অবশ্য দমবার পাত্র নয়। সাহেব মেমসাহেবকে সে চা খাওয়াবেই। খানিকটা গিয়ে ঘ্যাচাং ব্রেক কষেছে,—নিন স্যার, গলা ভিজিয়ে নিন।

মালবিকা তো আঁতকে উঠেছে দোকানটা দেখে। ভাঙাফাটা খাপরার চালা একটা। দোকানের সামনে বড় উনুনে বসানো আছে কালচিটে মারা কেটলি, মলিন বেঞ্চে গোটা তিন চার কুলিকামিন গোছের লোক, হাতে তাদের ছোট ছোট চায়ের গ্লাস। এখানে কী করে চা খাবে!

অর্ণবের অবশ্য ভ্রূক্ষেপ নেই, দিব্যি বলে দিল,—ফুটন্ত জলে দোষ নেই মিলু। আর এসব দোকানের চা...খেয়ে দ্যাখো, একটা আলাদা টেস্ট পাবে। বলেই গটগট নেমে গিয়ে সটান বসে পড়ল বেঞ্চিতে। চায়ের অর্ডার দিচ্ছে।

amarboi.com

সত্যি, বেড়াতে বেরোলে অর্ণব যেন একদম বদলে যায়। লাগামছাড়া। বুনো বুনো। দেখে কে বলবে এই মানুষই কলকাতায় কত কেতাদুরস্ত! মহার্ঘ হোটেল রেস্তোরাঁয় ঢুকে সামান্যতম ধুলো ময়লা দেখলে নাক কুঁচকোয়! অবলীলায় বলে, শ্যাবি জয়েন্ট! আবার সেই অর্ণবই সারান্ডা সিমলিপাল বেতলায় একেবারে অন্য চেহারায়। জঙ্গলের টানে জংলী হয়ে যায় যেন। কিছু বলতে গেলে আবার লেকচার মারবে, সব মানুষের মধ্যেই একটা অ্যানিম্যাল বাস করে মিলু। যে শ্রেণী বোঝে না, কৌলিন্য মানে না, নাফা লোকসান নিয়ে মাথা ঘামায় না, ওনলি বিলিভস্ ইন ইন্সটিংক্ট। তারঁ যা ইচ্ছে হবে সে তাই করবে। কেউ কেউ অ্যানিম্যালটাকে সারা জীবন চেনে আটকে রাখে। হয়তো পুরোপুরি পারে না, তবে সেরকম একটা ভান করে। আমি নয় কয়েকটা দিন ওই

শেকলটার বাইরে রইলাম।

কী যে অর্ণব বোঝাতে চায় কে জানে! ডাক্তারের জীবন তো সে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে, কেউ তো তার গলায় বকলস্ পরিয়ে দেয়নি!

শুধু চা নয়, সঙ্গে লেড়ো বিস্কুটও খেল অর্ণব। মালবিকাকেও গলাধঃকরণ করতে হল কষা কষা গরম পানীয়। চায়ের তেষ্টা মেটা তো দূরে থাক, মুখটাই বিস্বাদ হয়ে গেল।

পথে আর থামা হল না বড় একটা। একবার শুধু ক্ষণিকের বিরতি, টুকুসের বাথরুম সারার জন্য। ঘুম ভাঙতেই টুকুসের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল এলাচের গন্ধওয়ালা দুধের প্যাকেট, আর এক রাশ চিপ্স। রাস্তার দুধারে পড়ছে ছোট ছোট টিলা, কখনও কাছে আসে তারা, কখনও দূরে সরে যায়। বাচ্চাদের নিসর্গপ্রীতি তেমন গাঢ় নয়, উদাসীন চোখে চিপস্ খেতে খেতে বাইরেটা দেখছিল টুকুস। যুধিষ্ঠির গান চালিয়ে দিল জোর, ওই নিনাদেই টুকুসের বেশি আনন্দ।

গাড়ি আঙ্গুল পৌঁছোল প্রায় সাড়ে দশটায়। বনবিভাগের অফিস তখন সবে খুলেছে, তবে দপ্তর তখনও শুনশান। সরকারি অফিস বলে কথা! এক দিক দিয়ে তাতে অবশ্য মালবিকাদের সুবিধেই হল, ধীরেসুস্থে আহার সেরে নিল সবাই। আঙ্গুল বেশ বড় শহর, মোটামুটি এক সম্ভ্রান্ত হোটেলেই ঢুকেছিল অর্ণব, সেখানে খানিক বিশ্রাম নিয়ে সকলে দিব্যি তরতাজা। টুকুসও। ছোটাছুটি করছে এদিক ওদিক। জঙ্গল কোথায় জঙ্গল কোথায় বলে চেঁচাচ্ছে। এক ফাঁকে বনদপ্তর থেকে বাংলোর রিজার্ভেশান স্লিপও নিয়ে এল অর্ণব। টিকরপদায় কিছুই নাকি মিলবে না, তাই বাজার করতে হল গাদাগুচ্ছের। চাল ডাল তেল নুন আলু বেগুন পেঁয়াজ আদা রসুন, আরও অজস্র টুকিটাকি। আট আটখানা জ্যান্ত মুরগিও ঢুকে পড়ল ডিকিতে। সঙ্গে তিন ডজন ডিম, চার ডজন কলা, বিস্কুট পাঁউরুটি। সব কিছু গুছিয়ে টুছিয়ে নিয়ে ফের যুধিষ্ঠিরের রথে আরোহণ। ঘড়ির কাঁটা তখন একটা ছুঁইছুঁই।

গাড়ি ছাড়তেই ভাতঘুমে চোখটা জড়িয়ে এসেছিল মালবিকার। তন্দ্রা ছিঁড়ল টুকুসের চিৎকারে,—মা, মা,...অ্যানিম্যাল, অ্যানিম্যাল!

চোখ খুলেই মালবিকা থ। ওমা তাই তো, এক পাল বাঁদর নেমে পড়েছে রাস্তায়, গাড়ির আর নড়াচড়ার উপায় নেই। সরু পথ, দু পাশে শালগাছ...জঙ্গল এসে গেল নাকি?

যুধিষ্ঠির ক্রমাগত হর্ন বাজিয়েই চলেছে। বাঁদরগুলোর নড়াচড়ার লক্ষণ নেই। টুকুসও মহা উৎসাহে হ্যাট হ্যাট শব্দ করছে মুখে। কখন যেন ব্যাগ খুলে ডিজিটাল ক্যামেরা বার করে ফেলেছে অর্ণব, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শাটার টিপছে অবিরাম।

মালবিকা অবাক—আমরা কখন ফরেস্টে ঢুকলাম?

—তোমার তখন নাক ডাকছিল। ক্যামেরায় চোখ রেখে অর্ণবের উত্তর,—পম্পাসার গেটে, আই মিন সাতকোশিয়ার এন্ট্রি পয়েন্টে ফরেস্ট গার্ডের সঙ্গে কত গপ্পো করলাম, তুমি তো জাগলেই না।

মালবিকা লজ্জা পেল,—কাল রাতে ট্রেনে একদম ঘুম হয়নি যে।

একটা দুটো বাঁদর দল ছেড়ে এগিয়ে আসছে গাড়ির দিকে। টুকুস আঁকড়ে ধরল মালবিকার হাত,—ও মা, ওদের যেতে বলো না।

অর্ণব হ্যা হ্যা হাসল,—তোকে না নিয়ে যাবে না। ...তোর তো ভালই হল রে। নো পড়াশুনো, দিনরাত গাছে গাছে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবি। শুধু কার্টুন চ্যানেলটা দেখা হবে না, এই যা।

টুকুস আরও সিঁটিয়ে গেছে। মালবিকা তাড়াতাড়ি জানলার কাচ তুলে দিয়ে মৃদু ধমক দিল,—কেন ভয় দেখাচ্ছ?...এই যুধিষ্ঠির, আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে চলে যাও না।

ইঞ্জিন সামান্য গর্জন তুলতেই ঝটাঝট এবার পালাচ্ছে শাখামৃগের দল। অর্ণব আহ্লাদিত মুখে বলল,—ট্যুরটা মনে হচ্ছে ভালই জমছে। ঢুকতেই বাঁদর দর্শন নাকি গুড সাইন।

—দ্যাখো, হয়তো এই বাঁদরেই শুরু, বাঁদরেই শেষ। সারান্ডায় তো একটা হরিণ পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

—জন্তুজানোয়ারই কি জঙ্গলের সব? গাছগাছালি কিছু নয়?

তা বটে, এমন শালবনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার রোমাঞ্চও কি কম! দু পাশে ঘন সবুজ, আবছা আলো, আবছা আঁধার...এতেও তো একটা শিরশিরে অনুভূতি আসে। মনে হয় না এই নৈঃশব্দ কী রহস্যময়? সৌন্দর্যও আছে। বছর তিনেক আগে প্রায় এই সময়েই সিমলিপাল গিয়েছিল মালবিকারা। অরণ্য তখন লালে লাল। অশোক শিমুল আবির ছড়াচ্ছে। চোখ সেবার ধাঁধিয়ে গেছিল রঙে।

এই জঙ্গলে অবশ্য তেমন রঙের বাহার দেখতে পাচ্ছিল না মালবিকা। বনটা শেষও হয়ে গেল ঝুপ করে। এসে গেল এক খুদে গ্রাম। কালোকুলো বাচ্চারা খেলছে রাস্তায়, গাড়ির আওয়াজে ছিটকে সরে গিয়ে জুলজুল চোখে দেখছে তাকিয়ে। গ্রাম পেরিয়ে আবার শুরু হল জঙ্গল।

এভাবেই চলল আরও ঘণ্টা খানেক। আগাগোড়াই অরণ্য, তবে মাঝেমধ্যে বসতি এসে পড়ছে ছোটখাটো। জঙ্গল কোথাও ফিকে, কোথাও ঘন, পথও এখন আর সমতল নয়। রাস্তা খারাপও হচ্ছে ক্রমশ, পিচ উঠে হাড়গোড় বেরিয়ে গেছে, হঠাৎ হঠাৎ গর্তেও পড়ছে গাড়ি। জঙ্গলের পথে কচিৎ কখনও পথচারী দেখা যায়, তারপর আবার দীর্ঘক্ষণ শুনশান। দুধারে তখন শাল মহুয়া কেঁদ অর্জুন ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্বই নেই। উঁহু, আছে। একটা ছমছমে নৈঃশব্দ্য। অথবা বাতাসের সরসর। তার মাঝেই চকিতে ঝাপটা মারে পলাশ শিমুলের রং, দ্রুত সরে যায় তারা। শেষ পর্যন্ত টিকরপদার বনবাংলোয় যখন গাড়ি পৌঁছোল, সূর্য তখন অনেকটাই হেলে গেছে।

জঙ্গল আপাতত শেষ। সামনে মহানদী।

বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বনবিভাগের ঘেরা কম্পাউন্ড। পাহাড়ের প্রান্তসীমায়। গেটের ভেতরে তিন তিনখানা বিল্ডিং, সামনে চওড়া লন। একটা বাড়ি ঝকঝক করছে, দেখেই মালুম হয় বনবিভাগের হোমরাচোমরাদের বিশ্রামাগার, এবং সেখানে সাহেবসুবোদের

আনাগোনাও আছে নিয়মিত। একটি বাড়ির অতি দৈন্যদশা, সম্ভবত পরিত্যক্ত। মাঝেরটিই বুঝি অতিথিদের কুটির। সেটিরও চেহারা খুব সুদৃশ্য নয়। অ্যাসবেসটসের চাল, মলিন দেওয়াল, রংচটা দরজা জানালা...। কেন যে চেহারাগুলো একটু দেখনবাহার করে না!

সল্টলেকের ছবির মতন সাজানো বাড়িতে থাকা ডক্টর অর্ণব রায়ের অবশ্য এসবে কিছু যায় আসে না। জঙ্গলে ভাঙাচোরা ফাটাফুটো যাই মিলুক তাতেই সে খুশি। দিব্যি খোশমেজাজে নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে, গলা ফাটিয়ে ডাকাডাকি করছে চৌকিদারকে। পড়িমরি করে ছুটে এল এক বছর চল্লিশেকের লোক, খটাস স্যালুট ঠুকল অর্ণবকে। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মালপত্র নামাচ্ছে ঝটপট। তাদের সাগরেদ বনে গেছে টুকুস। দুহাতে মুরগি ঝুলিয়ে অন্দরে চলেছে যুধিষ্ঠির, উত্তেজিত মুখে টুকুসও ছুটছে পিছন পিছন।

মালবিকা ইতস্তত হাঁটছিল লনে। এক ভাবে বসে থেকে থেকে ঝিঁঝি ধরে গেছে পায়ে, হাঁটুর অবশ ভাবটা ছাড়াচ্ছিল। লনের সামনেটায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখছে নদী, দেখছে নদীর ওপারের পাহাড়টাকে। রোদ এসে পড়েছে পাহাড়ের মাথায়, সবুজ গাছগাছালিতে ঢাকা পাহাড়ে এখন হলুদের বিচ্ছুরণ।

বেশ লাগছিল মালবিকার। এমন সুন্দর এক নিসর্গে এসে ক্লান্তি যেন পলকে উবে যায়। নদী আর জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের এমন অপরূপ সহাবস্থান সে কি আগে দেখেছে কখনও? মনে তো পড়ে না।

মালবিকা ক্ষণিকের জন্য আনমনা। বুঝি বা দূরমনস্কও। পরক্ষণেই আমূল নাড়া খেয়ে গেছে। বনবাংলোর গেট অতিক্রম করে কে আসছে এদিকে? ঈষৎ দুলে দুলে? পরনে পাজামা পাঞ্জাবি, গালে সযত্নলালিত দাড়ি, হাতে একখানা শুকনো ডাল!

দিব্য না?

২

মালবিকাকে চিনতে দু এক সেকেন্ড সময় লেগেছিল দিব্যর। লাগারই কথা। আট বছর আগের মালবিকা আর এই মালবিকায় যে অনেকটাই তফাত। অতটা ছিপছিপে নেই আর, দিব্যি ভরভরন্তভাব এসেছে চেহারায়, লম্বাটে মুখখানা অনেকটাই গোলগাল। দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেও একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ফুটে আছে, যেন সে এই অরণ্যের সম্রাজ্ঞী।

চেনার পরেও ধাতস্থ হতে দিব্যর আরও খানিকটা সময় লেগে গেল। কলকাতার পথেঘাটে কোথাও দেখা হয়ে গেলে তাও নয় কথা ছিল, শেষে কিনা এমন একটা উদ্ভট জায়গায় এসে মুখোমুখি হল মালবিকার? একেবারে জঙ্গলের মধ্যে? সঙ্গে গাড়ি আছে মালবিকার। অর্থাৎ পতি সমভিব্যাহারে এসেছে নির্ঘাৎ। এগোবে কি দিব্য? কথা বলবে? নাকি মাথা নামিয়ে পেরিয়ে যাবে মালবিকাকে? অপরিচিতের মতো?

এড়ানোর সুযোগ পেল না, মালবিকাই পায়ে পায়ে সামনে,—কী ব্যাপার? তুমি এখানে?

মালবিকার স্বর এখনও একই রকমের রিনরিনে। হৃৎপিণ্ডটা ধড়াক করে লাফিয়ে উঠল দিব্যর। টের পেল রক্তকণিকারা অতি দ্রুত ছোটাছুটি করছে শিরাউপশিরায়।

কোনও ক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে দিব্য বলল,—বেড়াতে এসেছি।

মালবিকার কপালে ভাঙচুর,—একা?

—নাহ্। দিব্য ঠোঁটে হাসি ফোটাল,—বউ আছে।

দু এক সেকেন্ড থমকে রইল মালবিকা। তারপর তারও ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি,—যাক, বিয়ে করেছ তাহলে!

—হুঁ।

—ভাল। প্রতিজ্ঞাটা শেষ পর্যন্ত আর টিকিয়ে রাখতে পারলে না।

—হ্যাঁ, এক রকম বাধ্য হয়েই... বাড়িতে খুব জোরাজুরি করছিল... বলছিল, বয়স হয়ে যাচ্ছে, এবার থিতু হ...। অপ্রস্তুত মুখে কথাগুলো বলতে বলতে সহসা বেশ অস্বস্তি বোধ করল দিব্য। কেন সে এত কৈফিয়ত দিচ্ছে মালবিকাকে? শপথ তো মালবিকাই আগে ভেঙেছে, সে কেন মিছিমিছি একটা ফাঁপা অঙ্গীকারকে আঁকড়ে ধরে থাকবে? আর মালবিকার সামনে সে এখন কিন্তু কিন্তুই বা করছে কেন? দিব্য গলা ঝাড়ল,—আমিও ভেবে দেখলাম... কদ্দিন আর একা একা থাকি...।

—গুড। ভেরি গুড। প্রেমের বিয়ে।

—না মানে...। আবার কেন যে অস্বচ্ছন্দ ভাব এসে গেল দিব্যর গলায়, —সম্বন্ধ করেই... তবে চেনাজানার মধ্যে। আমাদের বহরমপুরেরই মেয়ে।

—ও। তার মানে বিয়ের আগে পরিচয় ছিল না?

—বললাম তো চেনাজানার মধ্যে। অল্পস্বল্প আলাপ ছিল...। দিব্য

আবার নিজের ওপর বিরক্ত। দুৎ, এত কেন ব্যাখ্যানে যাচ্ছে সে? গলায় একটা ভারিক্কি ভাব ফোটাল দিব্য,—আমি তুচ্ছ মানুষ, আমার কথা ছাড়ো। তুমি আছ কেমন?

—মন্দ কী। ঘর সংসার করছি, বাচ্চা মানুষ করছি...

—তোমার তো একটি ছেলে, তাই না?

—খবর রাখো তাহলে?

—না রাখলে কি বেশি খুশি হতে?

উত্তরে মালবিকা কী একটা যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মালবিকার বর হাজির। দিব্যকে ঝলক দেখে নিয়ে বলল,—বনবাসে এসে চেনা লোক পেয়ে গেছ মনে হচ্ছে?

মালবিকা দু গাল ছড়িয়ে হাসল,—হ্যাঁ। গ্রেট সারপ্রাইজ। আমার ইউনিভার্সিটির বন্ধু।

—ইজ ইট? গ্ল্যাড টু মিট ইউ। মালবিকার বর হাত বাড়িয়ে দিল,—আমি অর্ণব বসু। আপনার বান্ধবীর ওয়ার্স-হাফ।

হাতটাকে ফেরাতে পারল না দিব্য। করমর্দনের সময়ে টের পেল হাতটা যথেষ্ট ওজনদার। স্মিত মুখে বলল, —আমি দিব্যকান্তি মুখার্জি।

—উঠেছেন কোথায়?

—এখানে তো আর দ্বিতীয় কোনও জায়গা নেই। দিব্য হাত তুলে সামনের কটেজ প্যাটার্নের বাড়িটা দেখাল,—ডানদিকের রুমটায় আছি। লেপার্ডে।

—আপনি চিতা? আমি বাঘ। হা হা হা। নিজের রসিকতায় নিজেই ফেটে পড়েছে অর্ণব—খাসা নাম দিয়েছে কিন্তু রুমগুলোর। আমাদের একটা কচি রুমও আছে, তার নাম কাব্। হা হা হা। ভাবছি টুকুসকে ওই ঘরে শোওয়াব।

—টুকুস...?

—আমাদের শিবরাত্রির সলতে। ওই যে, চৌকিদারের অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করছে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার

করে বাড়িয়ে দিল অর্ণব,—চলে নিশ্চয়ই?

—নো। থ্যাংকস্।

—ভেরি গুড হ্যাবিট। আমি তো আমার প্রত্যেকটি পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করি, ভুলেও এই নেশাটি ধরবেন না। অবশ্য আমি নিজে পাপ কাজটি করেই চলেছি।

মালবিকা তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—জানো তো, অর্ণব একজন কার্ডিওলজিস্ট।

দিব্যর এবার মজা লাগছিল। বহুকাল আগেই তো মালবিকা বলেছিল তার বিয়ে হচ্ছে এক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞর সঙ্গে। মালবিকার কি ধারণা সে সব কথা ভুলে গেছে দিব্য? নাকি স্বামীর সামনে নাটক করল একটু?

চৌকিদার দুর্যোধন মালবিকাদের গাড়ি থেকে মাল বার করে জড়ো করছে বাংলোর বারান্দায়। অর্ণব ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছিল সেদিকে। হাল্কা ভাবে দিব্যকে বলল,—আপনি এখন আছেন তো?

—আমি নই, আমরা। আমি সস্ত্রীক আছি। ইচ্ছে করে সস্ত্রীক শব্দটায় একটু জোর দিল দিব্য,—পরশু ভোরের বাসে জঙ্গল ছাড়ব। ধৌলি ধরব কটক থেকে।

—যাক, আজ আর কাল তাহলে পাচ্ছি আপনাদের। জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে। আপত্তি নেই তো?

—কী যে বলেন! আমাদেরও খুব ভাল লাগবে।

—ও কে। তাহলে এখন যাই, ঘরটরের সাফাই করাই আগে। অর্ণব যেতে যেতেই ঘাড় ঘুরিয়ে হাত তুলল,—তোমরা ততক্ষণ গপ্পো করো।

অর্ণবের সম্রাটের মতো হেঁটে যাওয়াটা দেখছিল দিব্য। অনুচ্চ স্বরে বলল,—তোমার হাজব্যান্ড কিন্তু খুব হ্যান্ডসাম।

মালবিকা মুখ টিপে হাসছে,—লোকে তাই বলে বটে।

—সলিড স্বাস্থ্য। খুব লাইভলি।

আমার বই ডট কম amarboi.com

—মনটাও ভাল। এত নাম করেছে, তবু এতটুকু নাক উঁচু হয়নি। বাবা মাকে খুব ভক্তি করে, তাঁদের এতটুকু অসুবিধে হতে দেয় না। আর বউ ছেলের জন্য পাগলামি তো আছেই।

মালবিকা কি শোনাচ্ছে? বলতে চাইছে, দ্যাখো তোমায় বিয়ে না করে আমি কেমন বেঁচে গেছি? সুখে আছি?

মালবিকা অবশ্য দিব্যর প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় নেই। উল্টো প্রশ্ন ছুঁড়েছে,—তোমার খবর কী বলো? কী করছ এখন?

—মাস্টারি। স্কুল সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা দিয়েছিলাম, বছর পাঁচেক হল পেয়েছি।

—কোথায়?

—দমদম নাগের বাজারের কাছে। আমরা ওখানেই ভাড়া আছি।

—বউও চাকরি করে?

— চেষ্টা চালাচ্ছে। পায়নি এখনও।

মালবিকা ক্ষণকাল নীরব। কী যেন ভাবছে। হঠাৎই চোখে চোখ রেখে বলল,—তোমার বউ-এর নামটা কিন্তু এখনও জানা হয়নি।

—তোমার মতো বড় নাম নয়। নেহাতই সাদামাটা। দিব্য হেসে ফেলল,—ছবি। দেখতেও খুবই সাধারণ। গ্ল্যামার নেই তোমার মতো।

—আহা, আমার আর এখন গ্ল্যামার কোথায়! এক ছেলের মা...

দিব্যর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—এখনও তুমি সুন্দরই আছ মালবিকা। আগে ছিল রাজকন্যা, এখন রাজেন্দ্রাণী।

একটা খুশির বিভা ফুটে উঠছিল মালবিকার মুখে, ছেলের আচমকা ডাকে চোখের পাতায় কাঁপনটা থেমে গেল।

মালবিকা মুখ ফেরাল,—কী হল, চেঁচাচ্ছিস কেন?

—বাবা তোমায় জিজ্ঞেস করতে বলল টাওয়েলগুলো কোথায় রেখেছ?

—বল্ কিটস্‌ব্যাগেই আছে।

—বাবা খুঁজে পাচ্ছে না।

—ওফ্, জ্বালাল! মালবিকার ঠোঁটে সুখী সুখী হাসি,—সব কিছুতে আমার ওপর ডিপেন্ড করে আছে। কারুর সঙ্গে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলব সে উপায়ও নেই।

—না না, তুমি যাও। দিব্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—তোমরা এখন ক্লান্ত, যাও গিয়ে ফ্রেশ টেশ হও।

মালবিকা বাংলোর দিকে পা বাড়িয়েছে। সে ঘরে ঢুকে না যাওয়া পর্যন্ত দিব্য দাঁড়িয়ে রইল স্থির। তারপর পায়ে পায়ে ফিরেছে নিজেদের রুমে। আনমনা চোখে একটুক্ষণ দেখল ছবিকে। এখনও ঘুমোচ্ছে ছবি। আজ খুব ভোরে ওঠা হয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের অনেকটা ভেতরে চলে গিয়েছিল তারা। পথশ্রমে ভারী ক্লান্ত বেচারা। কাল বাস বদল করে করে আসার সময়েও তো কম ধকল যায়নি।

ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে প্লাস্টিকের চেয়ারটা টেনে বসল দিব্য। নাহ্, আট বছর আগে সিদ্ধান্তটা মালবিকা ঠিকই নিয়েছিল। কী সুখী মসৃণ জীবন। মালদার বরের কাঁধে চেপে অনন্ত আরামে বিলাসে বেশ তো কাটছে মালবিকার দিনগুলো। ভাল, খুব ভাল। কিন্তু আবার তার সঙ্গে এভাবে দেখা হওয়াটা কি জরুরি ছিল? প্রায় শুকিয়ে আসা ক্ষতস্থান কেন যে আবার খুঁচিয়ে দিল মালবিকা!

আবার একটা শ্বাস পড়ল দিব্যর। কেন যে পুরনো স্মৃতিগুলো ধেয়ে আসছে একের পর এক! তাদের প্রথম আলাপ, ধীরে ধীরে গাঢ় হওয়া ঘনিষ্ঠতা, স্বপ্ন দেখা, স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া...

প্রথম আলাপের দিনটা তো জ্বলজ্বল করছে। আলাপ মানে ভাল ভাবে পরিচয়। এম-এ ক্লাস শুরু হওয়ার মাস খানেক পর। ইউনিভার্সিটিতে রাখালদার ক্যান্টিনে আড্ডা মারছিল মালবিকারা। অনেকেই ছিল টেবিলে। ঋতুপর্ণা, সুদেষ্ণা, রাকা, অভিজিৎ, নীলাঞ্জন, আরও কে কে যেন। তখন বহরমপুর থেকে একটা লিটল ম্যাগাজিন বার করত দিব্যরা, তাতে রাকার একটা কবিতা বেরিয়েছিল, বইটা দিতে দিব্য গিয়েছিল রাকাদের টেবিলে। মালবিকা পত্রিকাটা হাতে নিয়ে

দেখছিল উল্টেপাল্টে। হঠাৎ একটা পাতায় থমকে গিয়ে বলল,—তুমিও কবিতা লেখো নাকি?

মফস্বলের ছেলে দিব্য তখন খুবই মুখচোরা। লাজুক হেসে বলেছিল,—ওই একটু আধটু।

—উহু, মোটেই অ্যামেচার নয়, বেশ পাকা হাত।

—তুমি কবিতা ভালবাসো?

—ওই একটু আধটু। রগুড়ে গলায় দিব্যর উত্তরই ফিরিয়ে দিয়েছিল মালবিকা,—যদি খুব দুর্বোধ্য না হয়।

—জটিল অনুভূতি কি সব সময়ে সহজভাবে প্রকাশ করা যায়? কবিতা তো পেন্টিং-এর মতো। পিওর এক্সপ্রেশান অফ মাইন্ড।

—ও মা, তুমি চান্স পেয়েই জ্ঞান দিতে শুরু করলে! মালবিকা খিলখিল হেসে উঠেছিল—একটা করে অন্তত চপ খাওয়াও, নইলে তোমার বক্তৃতা শুনব কেন।

দিব্য এবার যথেষ্ট অবাক। ক্লাসে মালবিকাকে সে দেখে বটে, কিন্তু সেভাবে বাকবিনিময় হয়নি কখনও। আপাত চোখে বেশ রিজার্ভড মতোই মনে হত মালবিকাকে। যেন সুন্দরী বলে একটা চাপা গুমোরও আছে। সেই মেয়ে এমন উচ্ছল হয়ে কথা বলতে পারে? এবং আরও আশ্চর্য ব্যাপার, সেই মালবিকা তার প্রেমেও পড়ে গেল!

কী যে মালবিকা দেখেছিল দিব্যর মধ্যে? নিশ্চয়ই চেহারা নয়, দিব্য ভাল মতোই জানে সে তেমন রূপবান নয় মোটেই। হাইট মেরেকেটে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, বুকের ছাতি চৌত্রিশও হবে কিনা সন্দেহ, গায়ের রং বিয়ের বিজ্ঞাপনের ভাষায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চোখ নাক মুখেও আলাদাভাবে কোনও যাদু নেই। মালবিকা অবশ্য বলত দিব্যর চোখদুটো নাকি সমুদ্রের মতো গভীর। হবেও বা। ভালবাসা তো মনে মনে অনেক কিছুই কল্পনা করে নেয়।

ইউনিভার্সিটির দুটো বছর যেন স্বপ্নের মতো কেটে গিয়েছিল। কত যে রঙিন কল্পনার জাল বুনত দুজনে। বিয়ের পর তারা কী ভাবে

থাকবে, দিব্যর একার রোজগারে না চললে মালবিকাও চাকরি করবে, ভাড়া নেবে সুন্দর একটা ফ্ল্যাট, মনের মতো করে সংসার সাজাবে, বছরে দু তিন বার দুজনে বেরিয়ে পড়বে ঘর ছেড়ে...। হানিমুন পাহাড়ে হবে, না সমুদ্রে, তাই নিয়ে খুনসুটি চলত অহরহ। দিব্যর পছন্দ ছিল পাহাড়, মালবিকার সমুদ্র। কেউ নিজের পছন্দ থেকে এক তিল সরবে না! কী হাস্যকর!

অনেকটাই দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল সম্পর্কটা। কলকাতায় তেমন কোনও আত্মীয় ছিল না দিব্যর, ইউনিভার্সিটিরই আরও দুটো ছেলের সঙ্গে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিল পাইকপাড়ায়, সেই ডেরাতেও বেশ কয়েক বার এসেছে মালবিকা। ওই বাড়িতেই তো মালবিকা একদিন উজাড় করে দিয়েছিল নিজেকে।

মনে পড়লে দিব্যর গায়ে এখনও কাঁটা দেয়। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। সম্ভবতঃ এপ্রিল কিংবা মে মাস। জুলাইতে ফাইনাল ছিল, তার মাস দু-আড়াই আগে। দিব্যর হঠাৎ জ্বর, পর পর দুদিন ইউনিভার্সিটি যায়নি, তৃতীয়দিন মালবিকা এসে উপস্থিত,—কী ব্যাপার, হঠাৎ ডুব মেরেছ কেন?

—কী করব, ইনফ্লুয়েঞ্জা একেবারে পেড়ে ফেলেছে।

—তাই তো! মুখটা শুকনো শুকনোই লাগছে তো! মালবিকা হাত রাখল কপালে,—হুম, গা তো বেশ ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে।

—আজ তাও নাইনটিনাইন, কাল দুই উঠেছিল।

—সে কী? আমায় খবর দাওনি কেন?

—কীভাবে দেব?

—তোমার ঘরের নন্দীভৃঙ্গিকে দিয়ে ইনফরমেশান পাঠাতে পারতে। ওরা দুজন আমাদের বিল্ডিং-এই তো ক্লাস করতে আসে, না কী?

—অরুণ দেশে গেছে। সুব্রতর মাসতুতো বোনের বিয়ে, তিনদিন ধরে সোদপুরে গিয়ে বসে আছে।

—তুমি একা? ...স্ট্রেঞ্জ, আমার বাড়িতেও তো একটা ফোন করতে পারতে। এভাবে জ্বর গায়ে...

—কী হবে তোমায় উত্যক্ত করে!

—যতসব ঢঙের কথা। ডাক্তার দেখিয়েছ?

—ভাবছিলাম আজ যাব। আর প্রয়োজন হবে না।

—কেন?

—তুমি এসে গেছ, জ্বর এবার পালাবেই।

—খাওয়া দাওয়া কী হচ্ছে?

—ওই মতির মা যা করে দিয়ে যায়...।

—বুঝলাম। মালবিকা হাত ধরে টেনে দিব্যকে বসাল বিছানায়,—লক্ষ্মী ছেলের মতো শুয়ে থাকো দেখি, আমি তোমার জন্য হরলিক্স কিনে আনছি। পাঁচ মিনিট।

পাক্কা আধ ঘণ্টা পরে ফিরল মালবিকা। ফর্সা মুখ রোদ্দুর মেখে লাল। ঘামছে। বেজার মুখে বলল,—তুৎ, বিচ্ছিরি পাড়ায় থাকো, একটা দোকানও খোলা নেই।

দিব্যর বুকের ভেতরটা কুলকুল করছিল। মালবিকার ওই দুচোখ ভরা উদ্বেগ, হতে পারে ওই ব্যাকুলতায় অনেকটাই ছেলেমানুষি ছিল, দিব্যর চব্বিশ বছর বয়সটাকে উদ্বেল করে তুলছিল। ছেলেমানুষি হলেও আবেগে তো কোনও খাদ ছিল না।

মালবিকাকে জড়িয়ে ধরে দিব্য বলেছিল,—আমার হরলিক্স বিস্কুট কিচ্ছু চাই না। শুধু তুমি কাছে থাকো, তাহলেই আমি...

কী কমিকাল ডায়ালগ! অথচ সেই মুহূর্তে ওই সংলাপই কী রকম উল্টেপাল্টে দিল সব। পাগলের মতো তাকে আঁকড়ে ধরল মালবিকা। চুমু খাচ্ছে তার ঠোঁটে গালে বুকে...। আর কি স্নায়ু নিয়ন্ত্রণে থাকে! কী সরল, অথচ গভীর আশ্লেষে সেদিন মিলিত হয়েছিল দুজনে!

ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর চোরা দংশনে ভুগছিল দিব্য। বলেছিল,—কাজটা বোধহয় আমরা ঠিক করলাম না মালবিকা।

মালবিকা নিঃশঙ্ক,—অন্যায় তো কিছু করিনি। আমরা তো পরস্পরকে ভালবাসি, নয় কী?

—তা ঠিক। তবু...

—তবু কিন্তুর কী আছে দিব্য? আজ বাদে কাল আমরা তো বিয়ে করবই।

সেই মালবিকাই মাত্র ছ মাসের তফাতে কেমন আমূল বদলে গেল। তখন সবে এম-এর রেজাল্ট বেরিয়েছে, দিব্য কলকাতার বাস তখনও ওঠায়নি। টিউশনি করছে গোটা কতক, চেষ্টা চালাচ্ছে চাকরির। মালবিকার সঙ্গে দিব্যর তখনও দেখাসাক্ষাৎ হয় নিয়মিত, অর্থহীন আলাপ প্রলাপে মালবিকা ও ক্লান্তিহীন।

হঠাৎই একদিন মালবিকা বলল,—বাড়িতে আমায় বিয়ের জন্য কিন্তু খুব জোরাজুরি করছে দিব্য।

দিব্য প্রথমটায় আমল দেয়নি। আলগা ভাবে বলেছিল,—কাটিয়ে যাও।

আমার বই . কম

—পারছি না। মা বাবা খুব অ্যাডামেন্ট। ছেলে কোথায় কোন বিয়েবাড়িতে আমায় দেখেছে, তার পছন্দ হয়েছে খুব, পাত্রপক্ষ অঘ্রানেই দিন ঠিক করতে চায়।

—সে পছন্দ করলেই তো হবে না, তুমি তোমার অমত জানিয়ে দাও। বলে দাও তোমার অন্য কাউকে সিলেক্ট করা আছে।

—বাবা মা শুনবেই না। তাদের তো জানো না...

—তাহলে সিম্পল কাজটাই সেরে ফেলি চলো। ছাদনাতলার দরকার নেই, সোজা রেজিস্ট্রি করে নিই।

—তারপর?

—কী তারপর?

—বাবা তো জানতে পারলে রাস্তা দেখিয়ে দেবে। তখন কী হবে? আমরা খাব কী? আমাকে নিশ্চয়ই তোমার বাবা মার ঘাড়ে ফেলে আসবে না?

—কিছু একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবে মালবিকা। চেষ্টা তো করছি। তুমিও নয় কিছু একটা...

—আমি ওরকম অনিশ্চিত নৌকোয় চাপতে পারব না দিব্য।

একটুক্ষণ থমকে ছিল দিব্য। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারপর কষটে গলায় বলেছিল,—তার মানে তোমারও ওই বিয়েতে মত আছে!

—বিশ্বাস করো, আমি নিরুপায়। ...বি প্র্যাকটিক্যাল দিব্য। এক্ষুনি এক্ষুনি যে আমাদের বিয়ে সম্ভব নয়, সেই পজিসানই নেই, এ কথা তুমিও ভালভাবে বোঝো, আমিও জানি। এই সিচুয়েশানে, আবেগে ভেসে না গিয়ে, ভবিতব্যকে মেনে নেওয়াটাই কি শালীন নয়? ...তুমি তোমার সুবিধে মতো ধীরেসুস্থে থিতু হও, ঘরসংসার করো...। মনে করো না, আমাদের মধ্যে একটা চমৎকার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, কোনও কারণে সেটা ম্যাচিওর করল না...

—আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না মালবিকা। বোকার মতো কেঁদে ফেলেছিল দিব্য,—তোমার জায়গায় আমি কাউকে বসাতে পারব না। কোনও দিন না।

হ্যাঁ, বোকামিই তো। মালবিকার জন্য চোখের জল ফেলাটা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কটা হয়েছিল নেহাতই জৈবিক নিয়মে। মালবিকার মতো হিসেবি মেয়ে আদৌ ভালবাসতে জানে কি? দিব্যর প্রতি আকর্ষণও ছিল নিছকই মোহ।

—অ্যাই, কী ভাবছ বসে বসে?

দিব্য চমকে তাকাল। আশ্চর্য, ছবি কখন ঘুম থেকে উঠেছে সে খেয়ালই করেনি? শুধু জেগে ওঠাই নয়, এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশটিতে!

ছোট্টখাট্টো ছবির চোখে কৌতূহল,—চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছ কেন গো?

—নাহ্, ভাবছিলাম।

—কি ভাবছিলে?

—পৃথিবীটা সত্যিই গোল।

—মানে?

সম্বিৎ ফিরেছে দিব্যর। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,—নীচে ঘড়িয়াল স্যাংচুয়ারির রাস্তাটা ধরে জঙ্গলের মধ্যে গিয়েছিলাম। ওমা, হাঁটতে হাঁটতে দেখি আবার বাংলোতেই ফিরে এলাম।

—তাই বলো। আমি ভাবলাম কী না কী! ছবির চোখে আলগা কৌতুক,—মিছিমিছি আবার বেরোলে। তার চেয়ে বরং একটু গড়িয়ে নিতে পারতে। কথা বলতে বলতেই টেবিল থেকে চিরুনি নিয়ে এসেছে ছবি। খোলা চুল চেপে চেপে আঁচড়াচ্ছে। চোখ টিপে বলল,—অবশ্য বিছানায় না আসাই ভাল। পাশে শুলেই তো তুমি দস্যিপনা শুরু করবে।

অন্য সময় হলে দিব্য হয়তো পাল্টা খুনসুটি জুড়ত, এখন ইচ্ছে করছে না। প্যাঁচপোঁচহীন এই সাদাসিধে মেয়েটাকে মিথ্যে বলার জন্য একটু যেন খারাপও লাগছে। সত্যি সত্যি তো সে অরণ্যের রাস্তায় ওইভাবে ঘুরপাক খায়নি! এই সব ছোট ছোট তঞ্চকতাই তো পরে অপরাধবোধের জন্ম দেয়।

নিজেকে সাফসুফ করতে চাইল দিব্য। সহজ সুরে বলল,—জানো, ওপাশের রুমে আমার ইউনিভার্সিটির এক ক্লাসমেট এসেছে। বর বাচ্চা নিয়ে।

—ওমা, কখন?

—এই তো, একটু আগে।

—আমায় ডাকলে না কেন? আলাপ করতাম।

—হবে হবে। ওরা তো পালাচ্ছে না। ...বিকেলে বেরোবে তো?

—নয়তো কি ঘরে বসে থাকব?

—থাকতেই পারো। আবার ঘুমোও। নাক ডাকাও।

—ইশ্ দুপুরে একটু শুয়েছি বলে...এই—যাবে তো এখন?

আমার বই রুম
amarboi.com

—কোথায় যাবে?

—যেদিকে নিয়ে যাবে।

—চলো তবে নদীর ধারে গিয়ে বসি।

—তাহলে তৈরি হয়ে নিই? চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব?

রান্নার জায়গায় গিয়ে দিব্য দেখল দুর্যোধন পকোড়া ভাজছে মহা উৎসাহে। নির্ঘাৎ মালবিকাদের ফরমাশ। মনমেজাজও এখন বেশ খোলতাই দুর্যোধনের। সরেস বাবু এসেছে, তার এখন পোয়া বারো।

দেখেই চটে গেল দিব্য। আচমকাই। রুক্ষ স্বরে বলল, —কী ব্যাপার তোমার? তাড়া না লাগালে তুমি চা দেবে না?

—দিচ্ছি বাবু। পাঁচ মিনিট।

—তাড়াতাড়ি করো। আমরা বেরোব।

দিব্য সরে এল। ফিরছে ঘরে। বারান্দায় দাঁড়াল ক্ষণেক। বাঘের ঘর থেকে গমগমে গলা উড়ে আসছে মালবিকার বরের। ছেলেটার স্বরও শোনা গেল। মালবিকার হাসিও। ঠিক যেন কাচ ভাঙার আওয়াজ। কাচের টুকরোগুলো কোথায় যেন বিঁধছে।

আবার একটা শ্বাস পড়ল দিব্যর। কেন এল মালবিকা? কেন দেখা হল?

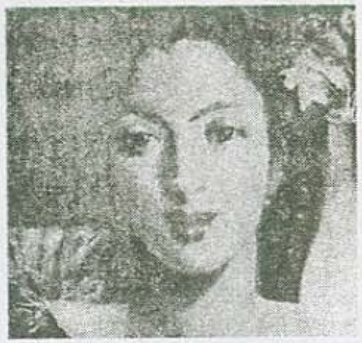

৩

আমার বই . কম
amarboi.com

আঁধার নেমেছে অরণ্যে।

টিকরপদার বনবাংলো অবশ্য অন্ধকার নয়। এদিকে কারেন্ট আসেনি এখনও, তবে কম্পাউন্ডের মধ্যেই বনদপ্তরের সাহেবসুবোদের বিশ্রামাগার, তাদের সেবায় ঢাউস জেনারেটার আছে একখানা। ডিজেলের জন্য আলাদা দক্ষিণা দিলে ট্যুরিস্টরাও জেনারেটারের সুবিধেটা পায়। বনবিভাগের কর্তব্যক্তিরা হরবখত পদধূলি দেয় বলে চৌকিদারের কাছে ডিজেলও হামেহাল মজুত। ডিজেলের দামটা একটু চড়াই নেয় চৌকিদার, ওই রোজগারটুকু তার উপরি লাভ।

জেনারেটারের দৌলতে এখন আলোকিত অতিথি নিবাসের দুখানা ঘর। টানা বারান্দাতেও জ্বলছে টিমটিমে বাতি। গর্জন বাজছে জেনারেটারের। জঙ্গলের নৈঃশব্দের মাঝে মূর্তিমান ছন্দপতন।

মালবিকা আর টুকুস বিছানায় বসে লুডো খেলছিল। সাপলুডো।

টুকুসের মুখ বেজার, ঘন ঘন সাপের মুখে পড়ছে।

অর্ণব ধারে আধশোওয়া হয়ে একটা ম্যাগাজিন উল্টোচ্ছিল। প্রকাণ্ড এক হাই তুলে মুড়ে রাখল বইটা। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল,—তোমরা তো মা বেটায় বেশ জমে গেছ, আমি এখন কী করি বলো তো?

—যা করছ তাই। মন দিয়ে জার্নাল পড়ো।

—ধুস্, এই জন্য জঙ্গলে এলাম নাকি? অর্ণব উঠে বসল,—তোমার বন্ধুটি কোথায় হাওয়া মারল বলো তো? বিকেলে তাদের টিকি দেখতে পেলাম না!

বিকেলবেলা মালবিকারা একবার বেরিয়েছিল গাড়ি নিয়ে। গেছিল পুরানাকোটের দিকে। মূল রাস্তা ছেড়ে ঢুকে পড়েছিল জঙ্গলে। গাড়িতে করে এলোপাথাড়ি অরণ্য পরিক্রমা অর্ণবের প্রিয় ব্যসন। গাছপালার বুনো গন্ধ তো উপভোগ করেই, ভাগ্যে থাকলে ক্বচিৎ কখনও জন্তুজানোয়ারেরও দর্শন মিলে যায়। সিমলিপালে গিয়ে বিকেলের শেষ আলোয় এক পাল গাউরের দেখা পেয়েছিল আচমকা, বেতলায় একজোড়া বুনো হাতির।

আজকের ভ্রমণ অবশ্য সেদিক দিয়ে বিফল। বেরনোর মুখে দিব্যদেরও খুঁজেছিল অর্ণব, তারাও বেপাত্তা। বউ নিয়ে দিব্য জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যে লুকিয়ে পড়েছিল কে জানে!

টুকুস ফস করে বলে উঠল,—ওই আংকল্‌রা তো ফিরে এসেছে। আমি দেখেছি।

—তাই নাকি? অর্ণবকে উৎসাহিত দেখাল,—ডেকে এনে আড্ডা জমাব নাকি?

টুকুস লাফিয়ে নেমেছে বিছানা থেকে,—আমি গিয়ে ডাকি?

—না। মালবিকার মৃদু ধমক,—আগে দান শেষ করো। আমি নাইনটি এইটে আছি।

—তাহলে আমিই যাই?

—কী দরকার! কপোতকপোতী নিজের মতো আছে, থাক না। সকালে দেখা হবে।

—জো হুকুম। অর্ণব নাক কুঁচকে দু এক সেকেন্ড ভাবল কী যেন। তারপর উঠে গিয়ে কিট্‌সব্যাগ থেকে হুইস্কির বোতল বার করেছে। তারপরই গগনবিদারী হাঁক,—চৌকিদার...?

নিয়মিত মদ্যপান করে না অর্ণব। বাড়িতে তো কালেভদ্রে, তাও বন্ধুবান্ধবদের জমায়েত হলে। ডাক্তারদের পার্টি টার্টিতে গেলে খায় বটে, তবে মেপেজুপে। শত অনুরোধেও তিন পেগ ছাড়াবে না। সেই অর্ণবই জঙ্গলে এলে বোতল খুলে বসবেই। আউট হবেই। হল্লাগুল্লা করবেই। অন্যত্র এ নিয়ে মালবিকা খুব একটা মাথা ঘামায় না। অক্লান্ত পরিশ্রম থেকে ছাড়ান পেয়ে প্রাণ যা চায় দু একদিন করুক না। কিন্তু টিকরপদায় দিব্য আছে, তার সামনে অর্ণবের মাতলামি কি ভাল দেখাবে? দিব্য যদি আড়ালে হাসাহাসি করে অর্ণবকে নিয়ে, মান থাকবে মালবিকার?

ভাবতে ভাবতেই ছক্কায় পুট পড়ল। নিরানব্বই-এর সাপ সতেরোয় নামিয়ে আনল মালবিকাকে। টুকুস মহা খুশি, হাততালি দিচ্ছে। মালবিকা ভার গলায় বলল,—আজ কিন্তু বেশি খেয়ো না।

অর্ণব সুঁই করে একটা শিস বাজাল,—কেন শেকল পরাচ্ছ ম্যাডাম? কী অপরাধ করলাম?

—মাতাল হওয়ায় কোনও গৌরব নেই।

কথার মাঝেই দরজায় টকটক। চৌকিদার।

অর্ণব ডাকল,—ভেতরে এসো।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছে লোকটা, আজ্ঞে স্যার।

অর্ণবের চোখ তেরছা, তোমার নামটা যেন কী...?

—দুর্যোধন স্যার। দুর্যোধন লায়েক।

—তা বাবা দুর্যোধন, আমার যে একটু চাট ফাট লাগবে।

দুর্যোধন এসব কাজে যথেষ্ট দক্ষ। বছর চল্লিশের কালোকুলো লোকটা দাঁত বার করে বলল,—ডিমের বড়া ভেজে দেব স্যার?

—সঙ্গে কয়েকটা পেঁয়াজি টেঁয়াজি হয় না?

—আপনি বললেই হবে স্যার।

—খানিকটা পেঁয়াজ শসাও কেটে দিও।

—আচ্ছা স্যার।

দুর্যোধন চলে যাচ্ছিল, আবার তাকে ডাকল অর্ণব,—আমার যুধিষ্ঠির কোথায়?

—কিচেনে মুরগি ছাড়াচ্ছে স্যার।

—বাহ্ বাহ্, দুর্যোধনকে হননকার্যে হেল্প করছে যুধিষ্ঠির! এ যে দেখি নয়া কুরুক্ষেত্র! দেখো, তোমরা আবার লাঠালাঠি কোরো না।

দুর্যোধন লজ্জায় অধোবদন,—কী যে বলেন স্যার!

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল দুর্যোধন।

অর্ণব বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে বলল,—তুমি একটু খাবে তো?

লুডোয় চোখ রেখে মালবিকা বলল,—নাহ্।

—কেন? বেড়াতে এলে তো তুমি খাও একটু আধটু?

—আজ নয়। বিকেলে পকোড়া খেয়ে এখনও গলা জ্বলছে। বমি টমি হয়ে যেতে পারে।

—তাহলে থাক। গ্লাসে সোনালি তরল ঢালছে অর্ণব। আন্দাজ মতো জল মিশিয়ে গ্লাসটা শূন্যে তুলে বলল,—চিয়ার্স! বেঁচে থাক টিকরপদা।

মালবিকার লাল গুটি আবার চড়চড়িয়ে উঠছে। পর পর তিনটে মই পেল, লাফাতে লাফাতে ঢুকে পড়েছে নয়ের ঘরে। টুকুসের উৎফুল্ল মুখ ক্রমশ ম্রিয়মাণ, পরাজয় আসন্ন বুঝে গা মোচড়াচ্ছে,—লুডো এখন থাক না মা। আমি একটু স্ক্র্যাবল্ করি।

—হেরে গিয়ে পালাচ্ছিস? ছি ছি। টুকুসের চুল ঘেঁটে দিল মালবিকা,—বেশ, কর যা ইচ্ছে।

ব্যাগ থেকে অক্ষর সাজানোর খেলাটা বার করে দিয়ে লুডো

টেবিলে উঠিয়ে রাখল মালবিকা। ঢকঢক করছে টেবিলটা, একটা পায়া বোধহয় আলগা হয়ে গেছে। ঘরের সর্বত্রই এই হাল। আলনা ওয়ার্ডরোব ড্রেসিংটেবিল সবই আছে, কিন্তু সব কিছুতেই রক্ষণাবেক্ষণের অভাব প্রকট। কোথাও বনবাংলোয় ফাইভ স্টারের সুবিধে থাকে না, তবে দশা ঠিক এই পদের নয়। একটা ডবলবেড খাট পর্যন্ত নেই, দুখানা পাতি তক্তপোষ জোড়া দিয়ে শয্যায় বন্দোবস্ত। চাদরটাদরগুলো দেখে তো মালবিকায় গা গুলিয়ে উঠেছিল। ভাগ্যিস নিজের চাদর বালিশের ওয়াড় ছাড়া বনবাংলোর জিনিস ব্যবহার করে না মালবিকা! আশ্চর্য, অর্ণবের কিন্তু কোনও হেলদোল নেই! দেখে মনে হয় জঙ্গলে এসে নোংরা মেঝেতে শুতে হলেও তার কোনও আপত্তি হবে না।

টর্চ হাতে বাথরুম ঘুরে এল মালবিকা। অর্ণব গ্লাস নিয়ে আবার চোখ বুলোচ্ছে ম্যাগাজিনে। তার পাশে বসতে গিয়েও বসল না। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসেছে বারান্দায়। ওপাশের ঘর বন্ধ, ঘষা কাচের জানলায় আলোর অস্বচ্ছ বিচ্ছুরণ। পা টিপে টিপে মালবিকা ঘরটার সামনে গেল। কান পাতল, যদি কোনও শব্দ শোনা যায়। উঁহু, কোনও সাড়াশব্দ নেই। করছেটা কী? ভরসন্ধেবেলা ভালবাসাবাসি চলছে নাকি?

আমার বই. কম
amarboi.com

কথাটা মনে আসা মাত্রই কোথায় যেন একটা চোরা জ্বালা। কোনও দৃশ্য মনে পড়ল কী? দিব্য কী ভাবে তাকে আদর করেছিল...? ওফ্, ভুলেই তো গেছিল, কেন যে আবার স্মরণে আসে!

একটু অস্থির পায়েই বারান্দা ছেড়ে লনে নেমে এল মালবিকা। হাঁটছে এদিক থেকে ওদিক। মাথার ওপর আকাশ এখন গাঢ় নীল। চাঁদ নেই, ওঠেনি এখনও। শলমা চুমকিতে ঝিকমিক করছে আকাশ। বাংলো ঘিরে ঝিঁঝিঁ পোকার অনন্ত কনসার্ট। কিছুই দেখছিল না মালবিকা। শুনছিলও না। তার কানে শুধু ধাক্কা মারছে জেনারেটারের একটানা গুমগুম ধ্বনি।

বিকেলে লনে বসে চা খেয়েছিল মালবিকা আর অর্ণব। চেয়ারদুটো

এখনও পড়ে আছে লনে। মালবিকা একটা চেয়ার টেনে বসল। দিব্য তাকে দেখে বেশি বউসোহাগী হয়ে পড়ল নাকি? তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে কী? মনে কোনও প্যাঁচ না থাকলে একবার তো আসা উচিত ছিল তাদের ঘরে। বউ-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারত। অর্ণবকে দেখে হীনমন্যতায় ভুগছে কী? নিজের ব্যর্থতা নতুন করে পীড়া দিচ্ছে?

নাকি দিব্য এখনও তাকে ঘৃণা করে?

দিব্য কি খবর রাখে না তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়তে গিয়ে কত বিনিদ্র রাত কাটিয়েছে মালবিকা? মনের সঙ্গে কী ভীষণ লড়াই চালিয়েছে? মরিয়া হয়ে বাবা মাকে দিব্যর কথা বলেছিল, কিন্তু শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে গেল তারা। দোষও তাদের দেওয়া যায় না। যথেষ্ট সুখস্বাচ্ছন্দে বড় হয়েছে মালবিকা, জেনেশুনে কী করে একটা কাঠ বেকারের হাতে তারা মেয়েকে তুলে দেয়? যেখানে চোখের সামনে একটা ঝকঝকে ডাক্তার জামাই নাচছে! দিব্য এমন কিছু ব্রিলিয়ান্টও নয়, রাজা গজা হওয়ার তার কণামাত্র সম্ভাবনা নেই, কেনই বা ওইরকম একটা ছেলের আশায় তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? বাবা তো রেগে মেগে বলেছিল, ওরকম বাংলায় এম-এ চিড়িয়াখানার খাঁচায় খাঁচায় নাকি দেখা যায়, পেটের দায়ে বাঘ ভাল্লুক সেজে খেলা দেখায়! শুনতে খারাপ লাগে ঠিকই, কিন্তু কথাটা তো মিথ্যে নয়। কীই বা প্রসপেক্ট ছিল দিব্যর? শেষ পর্যন্ত তো ওই মাস্টারিই জুটত কায়ক্লেশে। জেদের বশে বিয়ে করলে দারিদ্রের চাপে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত না তাদের প্রেম। মালবিকা তখন তর্জনী তুলত, তুমি আমার সর্বনাশ করলে...দিব্যও পাল্টা সাফাই গাইত, তুমিই বা কেন সব জেনেশুনে ল্যাং ল্যাং করে ছুটে এসেছিলে...! বিয়ের পরে অনুতাপ করার চেয়ে বিয়ের আগে তেতো সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই কি যুক্তিযুক্ত হয়নি? বরং এই তো ভাল। নিজের মতো করে আছে মালবিকা, এবং দিব্যও তো কিছু খারাপ নেই। তবে কেন মনে রাগ পুষে রাখবে দিব্য?

কম্পাউন্ডের গেটের কাছে রান্নাঘর। উনুন জ্বলছে। লালচে আগুন

দেখা যায় দূর থেকে। দুর্যোধন হঠাৎ বেরিয়ে এল রান্নাঘর ছেড়ে, দু হাতে দুখানা প্লেট। অর্ণবের হুইস্কির চাট যাচ্ছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে দুর্যোধনের যাওয়াটা দেখছিল মালবিকা। তখনই চোখে পড়ল ছোটখাটো চেহারার একটি মেয়ে বাংলোর সিঁড়ি বেয়ে নামছে। পরনে সালোয়ার কামিজ। নিশ্চয়ই দিব্যর বউ!

চোরা কৌতূহলটা কেন যে জেগে উঠল আবার? মালবিকা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল,—আপনি ছবি তো?

—চিনে ফেলেছেন? ছবি আরও কাছে এল,—আপনিই তো মালবিকাদি, তাই না?

মালবিকা ছবিকে দেখল ভাল করে। আলোআঁধারিতেও বোঝা যায় গায়ের রঙ তেমন ফর্সা নয়, নাকটা একটু বোঁচাই, তবে মুখখানা ভারী মিষ্টি। সন্ধ্যা রায় প্যাটার্ন।

মালবিকা হেসে বলল,—ও মা, তোমাকে আপনি বলছি কেন! তুমি তো বাচ্চা মেয়ে!

আমার বই . কম
amarboi.com

—খুব বাচ্চা নই, সাতাশ চলছে।

—তাই নাকি? দেখে তো মনে হয় কুড়ি।

—যাহ্। ছবি লজ্জা লজ্জা মুখে চেয়ার টেনে বসল,—জানেন তো, আমি কখন থেকে আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য ছটফট করছি। বিকেলেই যাচ্ছিলাম, ও বারণ করল। বলল, আপনারা খুব টায়ার্ড...। তারপর তো বেরিয়েই গেলাম।

—দিব্য কোথায়?

—ফিরেই শুয়ে পড়েছে। মাথার যন্ত্রণা। মাইগ্রেন।

তাই কী? নাকি ওটা মালবিকাদের এড়ানোর একটা কৌশল?

মালবিকা ভুরু কুঁচকে বলল,—ওষুধ খেয়েছে?

—বললাম তো, শুনল না। খানিকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থাকলে নাকি কমে যাবে।

এবার একটু ঠাট্টা করার লোভ হল মালবিকার,—মাথা টিপে

দিতে পারতে।

—দিলাম তো এতক্ষণ।

—তাহলে এবার সেরে যাবে। বহুকাল আগের একটা দুপুর মালবিকার চোখে এসেও হারিয়ে গেল,—তোমাদের তো লাস্ট ইয়ার বিয়ে হয়েছে, তাই না?

—হ্যাঁ। ছাব্বিশে ফাল্গুন। কাল আমাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী।

—তাই বলো! তোমরা তাহলে অ্যানিভারসারি সেলিব্রেট করতে এসেছ?

—সেরকম কিছু নয়। ...আসলে বিয়ের পর তো কোথাও যাওয়া হয়নি...

—সে কী? নো হানিমুন? দিব্য তো মহা বেরসিক।

—না না, তা নয়। আপনার বন্ধু তো টিকিট ফিকিট কেটে রেখেছিল। যেদিন পুরী রওনা দেব, সেদিনই হঠাৎ শ্বশুরমশাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন, হাসপাতালে ভর্তি করতে হল।

—ও। ...তুমিও তো বহরমপুরেরই মেয়ে, তাই না?

—হ্যাঁ। আপনার বন্ধুদের বাড়ি কাদাই, আমরা থাকতাম খাগড়ায়। ও তো আমার কলেজের বন্ধুর দাদা।

—দিব্যর বোনই বুঝি সম্বন্ধটা করেছিল?

—ওমা, না না, আপনার বন্ধুই সরাসরি আমায় বিয়ের কথা বলেছিল।

মালবিকা ছোট্ট একটা ধাক্কা খেয়ে গেল। তবু মুখটাকে যথাসম্ভব হাসি হাসি রেখে বলল,—সরাসরি বলল? কী ভাবে?

—সে এক গল্প। জানেন তো, আমি আমার ননদের দাদাটিকে বিয়ের আগে বেশ ভয়ই পেতাম। কীরকম যেন গম্ভীর গম্ভীর, কম কথা বলে...। তো হল কি, একবার ও বড়দিনের ছুটিতে বাড়ি এসেছে... আমিও গেছি শর্মিদের বাড়ি...সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, আপনার বন্ধুও নামছে...হঠাৎ একটা জোর কলিশান, আমিও পপাৎ ধরণীতলে...

—তারপর?

—হাড়গোড় ভাঙেনি, মাথাও ফাটেনি, শুধু গোড়ালিটা গেল বেকায়দায় মচকে। ব্যস্, টানা পাঁচ দিন বিছানায় ফ্ল্যাট। আপনার বন্ধুটি তখন প্রায় রোজই খোঁজ নিতে এসেছে। বলত না কিছু, অপরাধীর মতো মুখ করে চুপচাপ বসে থাকত। তারপর আমি যখন একটু হাঁটতে পারছি...একদিন ওকে দরজা অব্দি এগিয়ে দিতে গেছি, ফস করে বলে উঠল, আমায় বিয়ে করবে ছবি?

হাল্কা ভাবে কাহিনিটা শোনাচ্ছে ছবি। মালবিকা বুঝতে পারছিল ছবির ওই বাক্য কটার অন্তরালে আরও অনেক না বলা কথা রয়ে গেছে, যেগুলো ছবি বলছে না। হয়তো সদ্য আলাপে এর বেশি বিশদ হওয়াও যায় না। কে জানে কেন বুকটা চিনচিন করছিল মালবিকার। প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক অন্য কাউকে প্রণয় নিবেদন করে সফল হলে একটু কি আত্মশ্লাঘায় লাগে না? মনে হয় না কি, সে শুধু আমারই বিরহে আকুল ভেবে তাকে করুণা করার তৃপ্তিটাও উবে গেল?

আমার বই কম
amarboi.com

ঈষৎ বিরস স্বরেই মালবিকা বলল,—এটা কত দিন আগের ঘটনা?

—এই তো...তার মাস তিনেক পরেই তো বিয়ে হয়ে গেল।

—বাহ্, দারুণ। দিব্যটা তো বেশ করিৎকর্মা হয়ে গেছে দেখছি!

—নিন্দে করব না, করিৎকর্মা তো সে বটেই। ...আমি তো বাবা এখনও গুছিয়ে সংসার করতে পারি না, ও কী সুন্দর করে...। আমি তো বিয়ের আগে ভাল রান্নাও জানতাম না, দমদমের বাড়িতে আসার পর ওই আমায় রাঁধতে শেখাল। অনেকদিন কলকাতায় একা একা কাটিয়েছে তো, নিজের হাতে সবই করতে পারে।

—তুমি তাহলে বেশ ভাগ্যবতী। অজান্তেই একটা সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ফুটল মালবিকার গলায়,—দিব্যর মতো একটা গৃহী বর পেয়েছ...

—শুধু গৃহী নয়, অতি মাত্রায় গৃহী। বলতে পারেন ঘরকুনো। স্কুল আর বাড়ি, এর বাইরে আর নড়বেই না। এই যে এবার বেরোল, তার

জন্যও কি কম সাধ্যসাধনা করতে হয়েছে! বলে হানিমুন যখন ঘরেই হয়েছে, বিবাহবার্ষিকীটাও ঘরেই মানাই চলো। তাই কি ভাল লাগে, বলুন? ছবিকে ভারী তৃপ্ত দেখাচ্ছে। হাসিমুখেই বলল,—আমি আপনার ফটো দেখেছি, জানেন।

—আমার? কোথায়? মালবিকা ইষৎ চমকাল।

—অ্যালবামে। আমার বর, আপনি, আপনাদের ক্লাসের আরও কয়েকজন...। আপনার সঙ্গে নাকি ওর বেশি বন্ধুত্ব ছিল?

—আমি ওর কবিতার খুব ভক্ত ছিলাম। এখন লেখে কবিতা টবিতা?

—খুব কম। কোথাও তেমন পাঠায় টাঠায় না। বলে, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে অনেকেই অনেক রকম পাগলামি করে, সব কি আর জিইয়ে রাখা সম্ভব!

বটেই তো। মালবিকা মনে মনে বলল। এটুকু মাথায় রাখতে পারলেই তো মনে আর কোনও খেদ থাকে না।

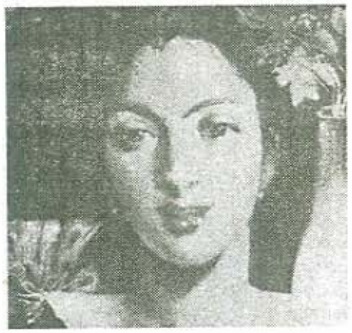

৪

আমার বই . কম
amarboi.com

—আপনার শুনলাম খুব মাথা ধরেছিল?

—ওই...একটু...

—প্রায়ই ধরে নাকি?

—নাহ্, মাঝে মাঝে।

—মাইগ্রেনের কিন্তু খুব ভাল ওষুধ আছে, সারিয়ে ফেলতে পারেন। ডোন্ট গো ফর ট্যাবলেটস্, ট্রাই যোগা। ব্রিদিং এক্সারসাইজে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। ব্রেনে অক্সিজেনের সারকুলেশানটা ঠিক মতো থাকলে...

লোকটা বকবক করেই চলেছে। এবার বুঝি দিব্যর সত্যি সত্যি মাথা ধরে যাবে। কোথায় ভাবল চটপট খেয়ে নিয়ে নিজের গুহায় সেঁধিয়ে যাবে, সেই ঠিক পড়ে গেল মালবিকাদের মুখোমুখি! নাহ্, মালবিকারা খেয়ে উঠে যাওয়ার পর টেবিলে আসা উচিত ছিল।

রাতের মেনু রুটি আলুভাজা আর মুরগির মাংস। সঙ্গে স্যালাড। রুটি ঝোলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ছেলেকে খাওয়াচ্ছে মালবিকা। মুরগিতে দুর্যোধন বেশ ঝাল দিয়েছে, ছেলেটা হুশ হাশ করছে, জল খাচ্ছে ঘন ঘন।

ছবি গায়ে পড়ে বলল,—আমাদের ঘরে সন্দেশ আছে, এনে দেব?

—টুকুস একদম মিষ্টি খায় না গো।

—খুব মিষ্টি নয়, ভাল লাগবে।

—ছোঁবেই না। যা পছন্দ করে না তা মুখেই তুলবে না।

ছবি তবু সাধছে,—একটু একটু করে কামড় দিলে ঝালটা কিন্তু কম লাগত।

—কী রে টুকুস, খাবি? আন্টি আনবে?

—না। আমি কোল্ড ড্রিংক্স খাব।

—তোর ড্রিংকস আর এখন কোল্ড কোথায় রে! অর্ণব হা হা হাসছে,—এখানে কি ফ্রিজ আছে!

—নেই কেন?

—কারণ জঙ্গলে যারা থাকে, তারা ফ্রিজের মাল খায় না। টাটকা টাটকাই পছন্দ করে। যেমন ধর, একটা বাঘ যদি এখন তোকে পায়, মাংসটা কি ফ্রিজে রাখবে? এক বারেই গপ করে খেয়ে নেবে।

—কোথায় বাঘ? একটাও তো দেখতে পেলাম না।

—যাবি দেখতে? রাত্তিরে? ওয়াচ টাওয়ারে? তোর যুধিষ্ঠিরদাদাকে তাহলে বলে দিই রেডি থাকতে।

—ওয়াচ টাওয়ারে গেলে বাঘ দেখা যায়? ছবি শুনেই উৎসাহিত হয়ে পড়েছে।

—চান্স একটা নেওয়াই যেতে পারে। অর্ণব যেন কথাটা লুফে নিল,—যাবেন নাকি ম্যাডাম?

ছবি দিব্যর দিকে ঘুরল,—কী গো, যাবে?

দিব্য অস্বস্তিতে পড়ে গেল। অর্ণব মালবিকাদের সঙ্গে রাত

কাটানোর মোটেই বাসনা নেই তার। আবার সরাসরি না বলাটাও অভদ্রতা হয়ে যায়। কী যে অড সিচুয়েশানে ফেলে দেয় ছবি। সন্ধেবেলা তো দুম করে মালবিকাকেই ঘরে এনে উপস্থিত। কেন রে বাবা, লনের আলাপ লনেই ছেড়ে আসতে কী হয়?

অর্ণব এবার দিব্যকে নিয়ে পড়েছে। মুরগির ঠ্যাং দাঁতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল,—কী স্যার, হয়ে যাক একটা নাইটট্রিপ। বাঘ না পেলেও থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্সটা তো হবে। অন্ধকার জঙ্গলে নির্জন টাওয়ারে চুপ করে বসে থাকবেন, নানান রকম শব্দ হচ্ছে...হঠাৎ হঠাৎ পাখির ডাক, দূর থেকে জন্তুজানোয়ারের গর্জন, শুকনো পাতার খড়মড় আওয়াজ, বাতাসের রহস্যময় গন্ধ...আমার একটা নাইটভিশান বাইনোকুলারও আছে, কিছু না কিছু অ্যানিম্যাল মুভমেন্ট আপনার চোখে পড়বেই। অ্যাট লিস্ট হরিণ।

বহুৎ চাপে ফেলছে তো লোকটা! দিব্য ঢোঁক গিলল,—শুনে খুব লোভই হচ্ছে। তবে কী জানেন তো...

আমার বই . কম
amarboi.com

মালবিকা ফস করে বলে উঠল,—তুমি ওদের জোরাজুরি করছ কেন? দিব্যরা বাঘ ভাল্লুক দেখতে জঙ্গলে আসেনি। ওরা এসেছে ম্যারেজ অ্যানিভারসারি করতে।

—ইজ ইট? এ তো আগে বলতে হয়। উচ্ছ্বসিত অর্ণব এঁটো হাতটাই করমর্দনের জন্য বাড়িয়ে দিচ্ছিল প্রায়, নিজের ঝোলমাখা হাতখানা ঝলক দেখে নিয়ে বলল,—অভিনন্দন। ক বছর হল?

ছবি লজ্জা লজ্জা মুখে বলল,—সবে এক বছর।

—তাহলে তো অলমোস্ট লাইক হানিমুন! অর্ণব হৈহৈ করে উঠল,—সরি সরি, তাহলে তো আপনাদের রাতে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না।

মালবিকা ভ্রূভঙ্গি করল,—যাক, মাথায় ঢুকেছে তবে।

—ও কে। ও কে। বললাম তো সরি। আগে জানলে কি প্রোপোজালটা দিতাম! বলেই দিব্যর দিকে ফিরেছে অর্ণব,—এনজয়

ইওর নাইট স্যার। ...জানেন তো, আমাদের ফার্স্ট অ্যানিভারসারিটা কী ভাবে কেটেছিল? আমরাও জঙ্গলে গেছিলাম। সিমলিপাল। ছিলাম বরেহিপানি লগ কেবিনে। পাক্কা আটচল্লিশ ঘণ্টা মাটিতে নামিনি আমরা। পরে সেই সিমলিপালের জঙ্গল আপনার বান্ধবীকে ভাল করে দেখাতে আবার আমাকে ছুটতে হয়েছিল। হা হা হা।

—আহ্, বড্ড বাজে কথা বলো। মালবিকা চোখ পাকাল,—থামো তো।

—কেন, ভুল বললাম কিছু? সেবার জঙ্গল দেখেছি? বলো?

—বকবক থামিয়ে খাওয়ায় মন দাও। ...রুটি দেব?

—দাও। এখানে একটু ঠেসে ঠেসেই খাই। কলকাতাতে তো স্যালাড টকদই স্টু আর স্যুপ। ওই খেয়ে খেয়ে লাইফ হেল্ হয়ে গেল।

—ইচ্ছেমতো খেলেই পারো। খাবারের কি কমতি থাকে?

—মাথা খারাপ! তাহলে যে অন্যের হৃদয় দেখার আগে নিজের হৃদয়ই ফাটিয়ে বসে থাকব।

—সিগারেট ফোঁকার সময়ে কথাটা মনে থাকে না?

—দেখেছেন তো দিব্যবাবু, আবার আপনার বন্ধু আমার অ্যাকেলিস্ হিলে হিট করছে!

মালবিকা-অর্ণবের খুনসুটিতে মজা না পেলেও ঠোঁটে এক ফালি হাসি ঝুলিয়ে রেখেছে দিব্য। তবে নিজেদের প্রসঙ্গটা ঘুরে যাওয়ায় স্বস্তি পাচ্ছিল একটু। মাথা নামিয়ে শেষ করছে আহার, বুঝি বা দ্রুতই। মালবিকার বরের প্রাণশক্তি একটু বেশিই, তার সামনে থেকে চটপট সরে পড়া ভাল।

ওদিকে টুকুসের শক্তি প্রায় নিঃশেষ। সারা দিন গাড়ির ধকল, তার ওপর ছোটাছুটি, ক্রমশ নেতিয়ে পড়ছে ছেলেটা। বায়নাক্কা জুড়েছে খাওয়া নিয়ে, বার বার বুজে আসছে চোখ। মালবিকা বিরক্ত স্বরে বলল,—এই তোমার ছেলেকে নিয়ে ঝঞ্ঝাট। ঘুম একবার পেল তো ব্যাস্, আর তাকে খাড়া রাখা যাবে না।

—শুইয়ে দিয়ে এসো। রাতে তো আবার বেরোতে হবে, এখন ঘুমিয়ে নিক।

—তুমি কি টুকুসকেও ওয়াচ টাওয়ারে নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করছ নাকি?

—নয়তো কি ও একা থাকবে? ...অ্যাই মিলু, তুমি নিশ্চয়ই পড়ে পড়ে ঘুমোনোর প্ল্যান করছ না?

—জ্বালালে। জঙ্গলে এলে তুমি যে কী খ্যাপা হয়ে যাও। বলতে বলতে মালবিকা টুকুসকে নিয়ে উঠে পড়েছে। কাঁধে ফেলে নিয়ে যাচ্ছে ঘরে।

অর্ণব খুশি খুশি মেজাজে দিব্যদের বলল,—শুনলেন আপনার বান্ধবীর কথা? জঙ্গল চিজই কুছ অ্যাইসি হ্যায়। আপনার ভেতরে একটা বুনো পাগল থাকলে তাকে আপনি লুকিয়ে রাখতে পারবেন না। আর মানুষ তো অরিজিনালি বুনোই। ঘর বাঁধা শিখেছে কদ্দিন আগে বলুন? দশ হাজার বছর? কি পনেরো হাজার? জিনে কি সেই জংলি যুগের ছিটেফোঁটাও নেই?

আমার বই . কম

ঢকঢক মাথা নাড়ানো ছাড়া দিব্য আর কীই বা উত্তর দেবে!

অর্ণবও অবশ্য শোনার অপেক্ষাতে নেই। বলে চলেছে,—যাক গে, আজকের রাত্তিরটা আপনারা ছাড়ান পেয়ে গেলেন। কাল দিনের বেলা কিন্তু আমাদের সঙ্গে বেরোতেই হবে। উই উইল হ্যাভ ট্রিপ টুগেদার। আমরাও তো আপনাদের অ্যানিভারসারিটা সেলিব্রেট করতে পারি, না কী? একসঙ্গে খানিক ঘুরব ফিরব হৈ হল্লা করব...কী, আপত্তি নেই তো?

ডাইনিং রুমে ফিরেছে মালবিকা। টেবিলে ফের বসতে বসতে বলল,—ওদের তুমি ডিসটার্ব করতে চাইছ কেন বলো তো? দুজনে এসেছে... অন্য কোনও প্ল্যানও তো ওদের থাকতে পারে।

—না না, যেতেই পারি। ছবি হঠাৎই বেজায় উৎসাহিত,—আপনাদের গাড়ি আছে, আমাদের সুবিধেই হবে।

সত্যি, ছবিটা না...! দিব্যর চোয়াল শক্ত হয়ে এল। গলাটাকে তবু যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল,—কিন্তু ওঁদের তো অসুবিধে হতে পারে। গাড়িতে গাদাগাদি করে...

—আরে দূর মশাই। যদি হয় সুজন, তো অ্যাম্বাসাডারে ডজন। আর আমরা তো সাকুল্যে সাড়ে পাঁচ। ইনক্লুডিং আওয়ার ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। মজাসে হয়ে যাবে।

—বেশ। দিব্য অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল,—কালকের দিনটা তো আসুক।

কথাটা বলার সময়ে পলকের জন্য মালবিকার চোখে চোখ পড়ল দিব্যর। দেখল, ঝটিতি দৃষ্টি নামিয়ে নিল মালবিকা, মন দিয়েছে আহারে। আর মাথা তুলছে না। উপরোধে দিব্য ঢেঁকি গিলতে রাজি হল বলে মালবিকা কি অপ্রসন্ন? নাকি তার একত্রে বেরোনোর অনিচ্ছেটাকে টের পেয়ে অপমানিত হল? বুঝতে পারছে না, দিব্য বুঝতে পারছে না। তুচ্ছ ব্যাপারটুকু না বুঝতে পারাও কোনও কোনও মুহূর্তে কী যে পীড়া দেয়।

বিস্বাদ লাগছে রুটি মাংস। আধখানা রুটি ফেলে রেখেই খাওয়া শেষ করল দিব্য। আড়চোখে দেখল ছবিকে। ভোজনপর্ব আগেই চুকিয়ে ফেলেছে সে, হাত গুটিয়ে বসে উপভোগ করছে অর্ণবের কথাবার্তা।

ইলাস্টিক হাসিটাকে ফের ঠোঁটে টেনে দিব্য বলল,—আমরা তাহলে এবার উঠি?

—ও শিওর। আপনাদের আর আটকাব না। অর্ণব কচকচ স্যালাড চিবোচ্ছে। হাত তুলে বলল, —কালকের প্রোগ্রাম কিন্তু ফাইনাল। দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে ভরা পেটে সোজা গহীন বনে।

ঘরে ফিরে দিব্য বিরক্তিতে ফেটে পড়ল। গলা চড়াল না, চাপা স্বরে হিসহিসিয়ে বলল,—তোমার আক্কেলের বলিহারি! ভদ্রলোকের কথায় ফস করে নেচে উঠলে?

দিব্যর অসন্তোষের কারণ মোটেই অনুধাবন করতে পারেনি ছবি। অবাক হয়ে বলল,—ভদ্রলোক অত আগ্রহ নিয়ে বলছেন, মুখের ওপর না বলে দেব?

—তুমিই তো লাফাচ্ছিলে। উৎসাহে ফুটছিলে।

—বা রে, গাড়িতে গেলে আরও কতগুলো স্পট দেখা হবে বলো তো?

—গাড়িতে যাওয়ার জন্য এত নাল ঝরার কী আছে? দিব্য গজগজ করে উঠল,—আমি পছন্দ করি না, আমি পছন্দ করি না।

ছবির মুখ পলকে করুণ। মাথা নীচু করে বিছানায় বসে রইল একটুক্ষণ। তারপর চোখের কোণ মুছতে মুছতে ঢুকে গেছে ঘরের লাগোয়া জায়গাটুকুতে।

ছবির কান্নাই বুঝি খানিকটা স্থিত করল দিব্যকে। সত্যি তো, মিছিমিছি ছবির ওপর রাগ ফলাচ্ছে কেন সে? হয়তো একটু উচ্ছ্বাস দেখিয়ে ফেলেছে ছবি, কিন্তু সে তো নিতান্তই সরল মনে। ছবি মোটেই লোভী মেয়ে নয়। বিয়ের পর থেকে এমন কিছু রাজার হালে তাকে রাখেনি দিব্য, কিন্তু তাই নিয়ে কখনও কি কণামাত্র অনুযোগ হেনেছে ছবি? আমার এই চাই, আমার ওই চাই বলে উত্যক্ত করেছে তাকে? ছবি মোটেই হাভাতে ঘরের মেয়ে নয়, তার চাওয়াটা আরও বেশি হলেও হতে পারত। মধুচন্দ্রিমা পর্যন্ত যাপন করা হয়নি, প্রথম বার্ষিকীতে বেড়াতে এসে দিব্য কিনা তার সঙ্গে রাগারাগি করল! এ যেন নিজের পরাজয়ের ঝাল অন্যের ওপর ঝাড়া। উচিত নয়, উচিত নয়।

ছবি ফিরছে না বাথরুম থেকে। ধন্দ জাগল দিব্যর, বাথরুমে কান্নাকাটি করছে নাকি?

নরম গলায় দিব্য ডাকল,—ছবি?

—উঁ? বাথরুম আর ঘরের মাঝখানে প্যাসেজ, অনেকটা অ্যান্টিরুমের মতো, সেখান থেকে সাড়া এল,—ডাকছ?

—হুঁ। কী করছ?

—চেঞ্জ করছি। কেন?

—শোন এদিকে।

নাইটি চড়িয়ে এসেছে ছবি। মেঘলা মুখে।

দিব্য দুপা গিয়ে ছবির কাঁধে হাত রাখল,—একটু বোঝার চেষ্টা করো। মালবিকার বর হয়তো ভদ্রতা করেই আমন্ত্রণ জানিয়েছে, কিন্তু আমরা কেন তাদের সঙ্গে গিয়ে ভিড়ব? এতে লোকে খেলো ভাবে।

—আমি ভাবলাম তোমার বন্ধুর বর বলছেন...

—বন্ধু ছিল একসময়ে। যখন পড়াশুনো করতাম, তখন। এখন সে আছে একটা লেভেলে, আমরা আর একটা লেভেলে। স্ট্যাটাস সমান না হলে বেশি মেশামিশি করা ভাল দেখায় না।

—আমি কি অত কিছু ভেবে বলেছি? আমি অত স্ট্যাটাস লেভেল বুঝি না। ছবির গলা ভার,—বেশ তো, কাল না গেলেই হল।

—সেটা আরও খারাপ দেখাবে। ...তুমি তো আবার ব্যাকব্যাক করে ম্যারেজ অ্যানিভারসারির কথাও মালবিকাকে বলে দিয়েছ।

—ওটা কথার পিঠে বেরিয়ে গেছে। তোমার বন্ধু হাজারো রকম প্রশ্ন করছিল...

দিব্যর চোখ সরু,—কী প্রশ্ন করছিল?

—কবে আমাদের বিয়ে হয়েছে, কী ভাবে হল...

অর্থাৎ দিব্যকে পুরোপুরি উপেক্ষা করছে না মালবিকা, বরং দিব্যর সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে পড়েছে। কিন্তু কেন? তার প্রত্যাখ্যানের আট বছর পরেও দিব্য কেমন আছে জানতে চায়? বুঝতে চায়, দিব্য এখনও বিরহটা জিইয়ে রেখেছে কিনা? নাকি ওসব শুধুই মেয়েলি জিজ্ঞাসা?

ছবি মশারি টাঙাচ্ছে। মৃদু গলায় বলল,—শোবে তো এখন?

—আর কাজই বা কী আছে?

—কালও কিন্তু আমরা খুব ভোর ভোর উঠব। আজ সকালটা তো তুমি গড়িমসি করেই কাটিয়ে দিচ্ছিলে।

—কোথায় যাবে কাল?

—এমনি জঙ্গলে হাঁটব। ভোরের অরণ্য দেখব। ছবি ফিক করে হাসল,—রাতদুপুরটা তো হল না, ফের ভোরই সই।

—এখনও তোমার আফশোস হচ্ছে?

—আফশোসের কী আছে! খুট চারটে লাগিয়ে দিয়ে ছবি জলের জগটা হাতে নিল। ঢকঢক খানিকটা গলায় ঢেলে বলল,—যাই বলো, মালবিকাদির বর মানুষটা খুব ভাল। দারুণ জমাতে পারেন। মুখটা অবশ্য একটু আলগা আছে। নিজেদের অ্যানিভারসারির গল্প ওভাবে কেউ বলে!

—হুম।

দিব্য আচমকা অন্যমনস্ক। চোখের সামনে দুলে উঠেছে এক কল্পদৃশ্য। নির্জন অরণ্যে এক লগকেবিন। কাঠের ঘরে উন্মত্তের মতো রতিক্রীড়ায় মেতে আছে একজোড়া নারী পুরুষ। শীৎকার বাজছে, পাইকপাড়ার সেই দুপুরটার মতো। দিব্য শুনতে পাচ্ছিল।

একটা বিশ্রী জ্বালা অনুভব করছিল দিব্য। শুকিয়েই তো গিয়েছিল ক্ষত, কেন আবার শুরু হল এই রক্তক্ষরণ?

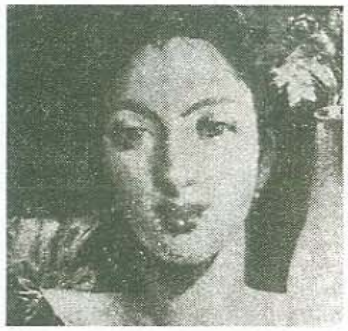

৫

মালবিকার ঘুম ভাঙল বেশ বেলা করে। কাল ওয়াচটাওয়ার থেকে রাত দুটোয় ফিরেছে। অর্ণবকে জোর করে না নামালে হয়তো বাকি রাতটাও মাচাতেই থাকতে হত। টুকুস যে টুকুস, ওই টুকুনি ছেলে, সে পর্যন্ত ড্যাব ড্যাব জেগে রইল অতক্ষণ!

বিছানায় উঠে বসে মালবিকা তাকাল এদিক ওদিক। বাপ বেটা গেল কোথায়? মালবিকার আগেই জেগে বেরিয়ে পড়ল নাকি বন চষতে?

চোখ রগড়াতে রগড়াতে বারান্দায় এল মালবিকা। নাহ্, দুজনেই আছে। টুকুস আর যুধিষ্ঠির বল লোফালুফি খেলছে লনে। অর্ণব চেয়ারে আসীন, সিগারেট টানছে।

—যাক, কুম্ভকর্ণের মাসির তাহলে নিদ্রাভঙ্গ হল!

—কখন উঠেছ তোমরা? আমায় ডাকোনি কেন?

—ডেকেছি কিনা ছেলেকে জিজ্ঞেস করো। হাঁকডাক শুনে বাঘ পর্যন্ত বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে!

—ঠাট্টা রাখো। বাজে কটা?

কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল অর্ণব,—দশটা বাজতে ন মিনিট পনেরো সেকেন্ড...এই হয়ে গেল চোদ্দ...তেরো...

—হুম্, তোমাদের ব্রেকফাস্ট হয়েছে?

—এবার দেবে। গরম গরম পুরি ভাজছে দুর্যোধন। সঙ্গে ছেঁচকি-ডি-পট্যাটো।

—দাঁড়াও, মুখ ধুয়ে আসছি।

বাথরুম ঘুরে অর্ণবের পাশে এসে বসল মালবিকা। না চাইতেই চোখ গেল দিব্যদের ঘরের দিকে। তালা ঝুলছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—এরা কোথায়?

—বেরিয়েছে কোথাও। বেড়াচ্ছে।

—তোমার ভয়ে পালাতেও পারে।

আমার বই . কম
amarboi.com

—তাও সম্ভব। তোমার বন্ধুটা বেশ একলষেঁড়ে টাইপ আছে। লোকজনের সঙ্গ তেমন পছন্দ করে না।

—সবাই কি তোমার মতন? বেড়াতে বেরিয়ে জাল ফেলে সঙ্গী খুঁজবে?

অর্ণব হা হা হাসল,—তোমার বন্ধু কি কলেজ ইউনিভার্সিটিতেও এই টাইপ ছিল?

—কিছুটা মুখচোরা তো ছিলই। কবিতা টবিতা লিখত, নিজে একটা লিটল ম্যাগাজিন বার করত...

—তাই বলো। ভাবুক মানুষ! ...আর সেই জন্যই জঙ্গলে একা ঘুরে বেড়ায়!

—একা কোথায়? বউ আছে তো সঙ্গে।

—বা রে, কাল দেখলে না...আমরা যখন এলাম, কবিমশাই তো তখন একাই জঙ্গলদর্শনে বেরিয়েছিলেন!

—হুম্।

—এবং তোমার বন্ধু কেন রাতে জঙ্গলে যেতে চাইল না, সেটাও এখন আন্দাজ করতে পারছি। অর্ণব মাথা দোলাল,—জঙ্গলের গাছ পাতা ফুল দেখে ওর কবিমন এতই বিমোহিত, যে রাত্তিরের রাক্ষুসে অন্ধকারটা ওর হজমই হত না। হিজ পোয়েটিক নার্ভস্ উড হ্যাভ সাফারড পেন্স।

দিব্যর কী হত না হত, মালবিকা জানে না। তবে অন্ধকারটা কাল স্নায়ুবিদারক ছিল বটে। দু চারদিনের মধ্যেই বোধহয় অমাবস্যা, জ্যোৎস্নার বালাই নেই, শাল মহুয়া অর্জুনে ভরা বন রাতে কী ভয়ংকর কালো! সিমলিপালেও বোধহয় এতটা ছিল না। অর্ণবের ইনফ্রারেড বাইনোকুলারেও কিছুই দেখা যাচ্ছিল না ভাল ভাবে। দু চারটে যা জন্তু চোখে পড়ল, তাও কেমন আবছা আবছা। মালবিকার আচমকাই মনে হল ওই গা ছমছমে অন্ধকার, যেখানে পাশের লোকটিও স্পষ্ট ভাবে দৃশ্যমান নয়, দিব্য ওয়াচ টাওয়ারে সঙ্গে থাকলে মন্দ হত না। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, অথচ তারা খুব কাছাকাছি আছে, এটা কি একটা অন্য ধরনের অভিজ্ঞতা নয়?

দুর্যোধন জলখাবার নিয়ে এসে গেছে। ঘর থেকে বেঁটে টেবিলটা এনে প্লেট সাজিয়ে দিল সামনে। অর্ণব-মালবিকার যেন সামান্যতম অসুবিধেও না হয় সেদিকে দুর্যোধনের কড়া নজর। কাল আসার পর থেকে কথায় কথায় যেভাবে দশ টাকা বিশ টাকা ছুঁড়ে যাচ্ছে অর্ণব। রজতমুদ্রা দুর্যোধন ভালই চেনে।

ডাকাডাকি করে টুকুসকে আনা হয়েছে বারান্দায়। নিজেও খাচ্ছে মালবিকা, ছেলেকেও খাওয়াচ্ছে। পুরি চিবোতে চিবোতে হঠাৎই জ্ঞানপিপাসা জেগে উঠল টুকুসের,—মা, সামনের ওই পাহাড়গুলো কি হিমালয়?

মালবিকা হেসে বলল,—দূর বোকা, হিমালয় কি এখানে নাকি? ওটা পূর্বঘাট পর্বতমালা।

—উঁহু, ভুলভাল শিখিও না। অর্ণব আপত্তি জুড়ল,—না রে টুকুস, ওটা ইস্টার্ন ঘাট নয়। ওই রেঞ্জটার নাম গড়জত হিল্স। ছোটনাগপুরের পাহাড় আর পূর্বঘাট পাহাড়, এই দুই রেঞ্জকে জয়েন করছে ওই পাহাড়গুলো।

—ছোটনাগপুর মানে সিমলিপালের পাহাড়?

—ঠিক তা নয়। আমরা সেই মধুপুর গেছিলাম...সেই যে লাট্টু পাহাড়...ওইগুলো।

—ও ও ও। টুকুস বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল,—আর এই জঙ্গলটার নাম সাতকোশিয়া কেন?

—গুড কোশ্চেন। কোশ মানে ক্রোশ। অর্থাৎ দু মাইল। আর সাত তো সেভেন। ...তার মানে সাত ইনটু টু চোদ্দ মাইল...মহানদী চোদ্দ মাইল রাস্তা এই পাহাড়গুলোর মধ্যে দিয়ে গিয়ে সমতলে পড়েছে। আর এই পথটুকুতে দু পাশে গড়ে ওঠা জঙ্গলের নাম হয়েছে সাতকোশিয়া। অ্যাকচুয়ালি এটার নাম সাতকোশিয়া-গোই। গোই মানে গিরিখাত। দেখছিস না, নদীটা কেমন পাহাড়ের মধ্যিখান দিয়ে খাত তৈরি করে চলে গেছে!

—নদীটাই কি খাত তৈরি করেছে বাবা? নাকি ওই খাতটা ছিল বলেই নদীটা এখান দিয়ে বইছে?

—এ্যানাদার গুড কোয়েশ্চেন। ডিম আগে, না মুরগি আগে! অর্ণব মাথা চুলকোল,—মনে হচ্ছে নদীটাই খাতটাকে তৈরি করেছে...কী মিলু, তোমার কী মনে হয়?

—তাই হবে। নদী না থাকলে হয়তো গোটাটাই টানা জঙ্গল হত। বলেই মালবিকা তাড়া লাগাল,—অনেক জ্ঞান লাভ হয়েছে, এবার তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করো। চলো, গিয়ে কুমীর প্রকল্পটা দেখে আসি।

পুরি ফুরোতে না ফুরোতে চা হাজির। চা খেয়ে, জামাকাপড় বদলে বেরিয়ে পড়েছে মালবিকারা। গাড়ির প্রয়োজন নেই, বনবাংলোর লন থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে পিচরাস্তায়, রাস্তা ধরে পঞ্চাশ একশো গজ

আমার বই . কম
amarboi.com

হাঁটলেই কুমীরদের প্রজননাগার। সার সার খাঁচায়, ছোট বড় জলাশয়ে, শোভা পাচ্ছে নানান সাইজের ঘড়িয়াল। বিঘৎ খানেকেরও আছে, আবার হাত দশেকেরও। মা, বাচ্চা...। কেউ বা ডাঙায় রোদ পোহাচ্ছে, কেউ বা ঘাপটি মেরে জলে। একটা বড়সড় ঘড়িয়াল তো মুখ হাঁ করেই আছে, খাদ্যের অপেক্ষায়। ঘড়িয়ালটার অসীম ধৈর্য দেখে টুকুস তো তাজ্জব। তবে ছুঁচোলো মুখ সরীসৃপগুলোকে মোটেই তার পছন্দ হয়নি, মাঝে মাঝেই নাক সিঁটকোচ্ছে।

কুরূপ প্রাণীগুলোকে দেখতে মালবিকারও ভাল লাগছিল না। সরে এল পাশ থেকে। তখনই দেখতে পেল দিব্যদের। প্রকল্পের পরেই শুরু হয়েছে অরণ্যের পথ, সেদিক থেকেই আসছে দিব্য আর ছবি।

অর্ণবেরও নজর গেছে। চেঁচিয়ে উঠল,—কী মশাই, কোথায় হাওয়া হয়ে গেছিলেন?

—এমনিই হাঁটছিলাম। দিব্যরা কাছে এল,—সকালের জঙ্গল দেখছিলাম।

—কেমন লাগল?

—দারুণ। অদ্ভুত একটা স্মেল আছে।

অর্ণব মিটিমিটি হাসছে। মালবিকার দিকে ফিরে বলল,—দেখেছ তো, কী বলেছিলাম?

দিব্য ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকাল।

অর্ণব ফের বলল,—আপনার বন্ধুকে বোঝাচ্ছিলাম কেন আপনি নাইট ফরেস্টে ইন্টারেস্টেড নন। যতই হোক কবি মানুষ তো, জঙ্গলের বিউটি আপনাকে টানবে, বাট নট দি ভয়ংকরতা।

—দুর আমি আবার কবি।

—বিনয় করবেন না স্যার। আমার মিসেস সব ফাঁস করে দিয়েছে।

—সব? দিব্যর গলা কেঁপে গেল।

—ইয়েস স্যার। আপনার পোয়েট্রি, আপনার লিটল্ ম্যাগাজিন

বার করা, এভরিথিং।

—ও। দিব্য স্বস্তির শ্বাস ফেলল। সহজ স্বরে বলল,—সে এক সময়ে মাথায় ভূত চেপেছিল বটে। এখন ওসব কোথায় উবে গেছে।

—তো কী আছে! এ পোয়েট ইজ অলওয়েজ এ পোয়েট। সে কবিতা লিখুক, ছাই না লিখুক।

—কী যে বলেন! ...যাকগে, কাল রাতে জন্তুজানোয়ার কিছু সাইট করতে পারলেন?

টুকুস উল্লসিত হয়ে বলল,—আমরা হাতি দেখেছি গো আংকল। দুটো।

—তাই? আর কী দেখলে?

—বাইসন। ...আরও একটা কী যেন দেখলাম, বাবা?

—এক পাল শম্বর। তবে ক্লিয়ারলি ভিজিবল্ হয়নি।

—বাহ্, তাহলে তো আপনাদের নৈশ অভিযান সার্থক?

—কোথায় আর! টুকুস বাঘ দেখতে পেল না।

—বাঘ বোধহয় এখানে তেমন নেই'ও। দুর্যোধন বলছিল গোটা জঙ্গলে নাকি হার্ডলি দুটো চারটে আছে। ভেরি রেয়ারলি তাদের দর্শন পাওয়া যায়। লেপার্ড টেপার্ড তাও নাকি কখনও সখনও চোখে পড়ে।

—হুঁ। এখানকার অ্যানিম্যাল স্ট্রাকচারটা মোটামুটি বুঝে গেছি। হরিণ বাইসন হাতি বুনো শুয়োর আর ওই খাঁচাবন্দি ঘোড়েল... সাতকোশিয়ার এটুকুই সম্বল। অফকোর্স স্নেক আর পাখিদের আমি গোনায় ধরছি না।

অর্ণব-দিব্যর আলাপচারিতার মাঝে ছবির ওপর নজর পড়েছে মালবিকার। কালকের হাসিখুশি মেয়েটাকে আজ যেন একটু চুপচাপ লাগে না? বুঝি বা সামান্য আড়ষ্টও। দিব্য কি কাল কিছু বলেছে ছবিকে? জানিয়ে দিয়েছে তাদের অতীত কাহিনী? কী বলেছে? কতটা বলেছে? কোন কোন রং বুলিয়েছে তুলিতে? স্রেফ সাদা কালো? মালবিকা মোটেই সুবিধের মেয়ে নয়, মালবিকা একটা ফ্লার্ট, মালবিকা

আমার বই ডট কম amarboi.com

তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছিল, তারপর এক শাঁসালো বরের সন্ধান পেয়ে তাকে ডিচ মেরে সুড়সুড় করে কেমন লোকটার গলায় মালা দিয়েছিল...? বলা যায় না, বউ-এর কাছে হিরো সাজার জন্য অন্য গল্পও তৈরি করে থাকতে পারে। হয়তে বা বলেছে, মালবিকা তার ওপর মোহিনীমায়া বিস্তার করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার ছলাকলায় ভোলেনি দিব্য! এবং এই ধরনের মেয়েদের থেকে ছবির দূরে থাকাই মঙ্গল! বউ-এর চোখে তাকে একটু ছোট করতে না পারলে কি দিব্যর প্রাণ জুড়োবে!

টুকুস একটা প্রজাপতিকে তাড়া করে রাস্তার ধারটায় চলে গিয়েছিল। ঘুরে এসে অর্ণবকে ধরেছে,—বাবা, আমরা নদীতে স্নান করব।

মালবিকা সম্বিতে ফিরেছে। টুকুসের বায়না শুনে আঁতকে উঠল। মহানদী এখানে যথেষ্ট চওড়া, অনেকটা নীচে দিয়ে বইলেও তার স্রোতের খরতা বেশ টের পাওয়া যায়। টুকুসের হাত ধরে সে বলল,—না না, এখানে কেউ স্নান করে না। এটা স্নান করার নদী নয়।

—কেন মা? ওই তো একজন করছে!

—হ্যাঁ তো। বটেই তো। পলকে অর্ণবের চোখ চকচক,—নামলেই হয়।

—না না, কুমীর টুমির আছে। ...শোননি, দুর্যোধন কাল কী বলল? এখানকার কুমীরগুলোকে তো বড় হলে নদীতেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

—দূর দূর, ঘড়িয়াল আবার কুমীর! ওরা তো মাছ খায়। মালবিকাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিল অর্ণব। খোশমেজাজে দিব্যকে বলল, —কী মশাই, নামবেন নাকি?

—আমি?

—বুঝেছি। আপনার কবিমন পাড়ে বসে থেকেই আনন্দ পায়। জলে বডি ভাসাতে আপনার ভয় আছে।

ছবি ফস করে বলে উঠল,—মোটেই না। ও তো কাল নেমেছিল।

—ইজ ইট?

—হ্যাঁ। আমরা তো কাল নদীতেই...

—তাহলে তো আর কোনও আপত্তি চলে না মিস্টার দিব্যকান্তি। অর্ণব কাঁধ ঝাঁকাল,—মিলু, চলো তাহলে তোয়ালে টোয়ালে নিয়ে আসি।

—সে তোমার যা ইচ্ছে করো, আমি ওতে নেই।

—কাম অন মিলু, বি আ স্পোর্ট। তুমি যে আমাদের ক্লাবের কোমর জলের সুইমিং পুলের বাইরেও সাঁতার কাটতে পারো, সেটা একটু দেখিয়ে দাও।

টুকুসও জোরাজুরি শুরু করেছে,—প্লিজ মা...চলো না মা...

মালবিকা ছবিকে জিজ্ঞেস করল,—তোমরা কি নামবে?

ছবির দৃষ্টি দিব্যতে। অস্বচ্ছন্দ স্বরে দিব্য বলল,—আজও ইচ্ছে হলে চলো।

অগত্যা মালবিকাকেও রাজী হতেই হয়। বাংলো থেকে এসে গেল তোয়ালে।

amarboi.com

পিচরাস্তা থেকে নদী অন্তত শ খানেক ফুট নীচে। ঢালের গায়ে সিঁড়ি গোছের একটা আছে বটে, তবে তার ধাপগুলো বড্ড উঁচু উঁচু। সতর্ক পায়ে নামছিল সবাই। অর্ণব চেপে ধরে আছ টুকুসের হাত, দিব্য ছবিকে। মালবিকা একাই, সবার শেষে।

নদীর পাড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর। ঠিক পাড়ে নয়, নদীতেই। পাথরের খাঁজখোঁজ দিয়ে বহে যাচ্ছে নদী। মাঝনদীতে জলের স্রোত ক্ষুরধার হলেও তীরে ততটা নয়, সম্ভবত ওই পাথরের বাধাতেই খানিকটা মন্দীভূত হয়েছে তার গতি।

জলে পা ছুঁইয়েই অর্ণব উচ্ছসিত,—আহ্, কী ঠাণ্ডা! যেন ফ্রিজের জল!

দিব্য জলে নেমেই টুপ করে একটা ডুব দিয়ে নিল। অর্ণবকে বলল,—গোটা শরীরটা আগে ভিজিয়ে নিন, তাহলে আর অত ঠাণ্ডা

লাগবে না।

অর্ণব বলল,—সাঁতরে মাঝখানটায় চলে যাই?

দিব্য বলল,—ভুলেও চেষ্টা করবেন না। একে ওই কারেন্ট, তার ওপর দুর্যোধন বলছিল তলায় নাকি উল্টোপাল্টা পাথরও আছে, নদীর ডেপ্থও বেশি নয়, চোট লাগলে আর দেখতে হবে না।

টুকুসকে নিয়ে নেমেছে অর্ণব। ছবি দিব্যর সঙ্গে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মালবিকাও পা বাড়াল। পাথরগুলো অসম্ভব পিছল, দেহের ভারসাম্য ঠিক রাখা কঠিন, সাবধানে গুটি গুটি এগোচ্ছে মালবিকা। থামল কোমরজলে এসে। সত্যিই জলটা চমৎকার, ভারী আরাম লাগছে। জঙ্গলের মধ্যে নদীতে অবগাহন, এ এক নতুন অভিজ্ঞতা বটে।

বহতা নদীর মৃদু শব্দ ধাক্কা দিচ্ছিল মালবিকার কানের পরদায়। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকটা দেখছিল মালবিকা। সূর্য প্রায় মাঝগগনে, রুপোলি রোদে ঝিকমিক করছে নদীর জল। রোদ ছড়িয়ে আছে ওপারের পাহাড়ের গায়ে। সবুজের বুকে নীলচে আভা একটু যেন হাল্কা লাগে। খানিক দূর গিয়ে বাঁক নিয়েছে নদী, লুকিয়ে পড়েছে পাহাড়ের আড়ালে। নদী বেয়ে একটা ডিঙিনৌকো তরতর এগিয়ে চলেছে। কোথায় যায় ওই নৌকো? কত দূর যায়?

মালবিকার বুকটা হঠাৎ শিরশির করে উঠল। যে মহানদী এখানে এত তন্বী, এত উচ্ছল, মাত্র শ খানেক মাইল গিয়ে সেই নদীই শেষ পর্যন্ত শুধু বালির চর! কখন বর্ষা আসবে তার প্রতীক্ষায় ঝিমিয়ে থাকে বছরভর! কী আশ্চর্য, তাই না?

ভাবতে ভাবতে বুঝি বা একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল মালবিকা। তখনই কীভাবে যেন পা দুটো পিছলে গেছে পাথর থেকে। সামনে জল অনেকটা গভীর, স্রোতও বেশি, ঘটনার আকস্মিকতায় মালবিকা প্রায় ভেসেই যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা হাত টেনে ধরেছে তাকে। না, অর্ণব নয়। দিব্য। হ্যাঁচকা টানে মালবিকা প্রায় তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছিল, নিজেকে সরিয়ে নিয়ে খাড়া করল কোনওমতে। হাঁপাচ্ছে।

দিব্য ভর্ৎসনার সুরে বলল,—করছটা কী? বি অ্যালার্ট।

মালবিকা নীচু গলায় বলল,—সরি।

—জল টল খাওনি তো?

—নাহ্।

হাত চার পাঁচ তফাতে অর্ণব। ছেলেকে নিয়ে জল ছেটাছিটি খেলছে। প্রবল উল্লাসের মাঝে বাপ ছেলে কেউই বোধহয় দেখতে পায়নি দৃশ্যটা। দিব্য ছাড়া একমাত্র ছবিই যা প্রত্যক্ষদর্শী।

আতঙ্কিত স্বরে ছবি বলে উঠল,—আর থাকতে হবে না মালবিকাদি, চলুন উঠে পড়ি।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মালবিকার খেয়াল হল দিব্যর হাত তখনও তার কাঁধ খামচে আছে। পলকের জন্য মনে হল দিব্যর দৃষ্টিটাও যেন কেমন কেমন!

পরক্ষণেই অবশ্য হাত সরিয়ে নিয়েছে দিব্য। তবু স্পর্শটা যেন লেগেই রইল কাঁধে। আট বছর আগের একটা ভারী স্মৃতির মতো।

আমার বই . কম
amarboi.com

৬

—আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়?

—ধরে নিন জাহান্নমে।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু জাহান্নমের নামটা কী?

—জাহান্নমের আবার নাম কী মশাই? জাহান্নম ইজ জাহান্নম। অর্ণব হেসে উঠল,—জাহান্নম ইজ আ প্লেস, মাচ মোর লাভেবল্ দ্যান দিস সিলি আর্থ। ইভন্ মোর এনজয়েবল্ দ্যান সো কলড হেভেন।

দিব্যও হেসে ফেলল,—আপনি বুঝি মাঝেমাঝেই এরকম জাহান্নমে যান?

—চেষ্টা তো করি, হয়ে ওঠে কই! এই সব বউ বাচ্চা নিয়ে ফেঁসে গেছি না! এদের মুখে দু মুঠো অন্ন জোগাতে গিয়ে আমার জাহান্নম শিকেয়। তার মাঝে কদিন একটু এলোমেলো হওয়ার চেষ্টা করি, আর মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি এটাই আমার জাহান্নমে যাওয়ার স্বর্গসুখ।

এবার মনে মনে হাসল দিব্য। বিলাসে অভ্যস্ত, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে প্লাবিত নিয়মে মোড়া জীবনে এ ধরনের দুঃখবিলাস সাজে বৈকি। ওদিকে নাড়ি টিপে আর বুকেপিঠে স্টেথো ঠেকিয়ে লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে, এদিকে বেড়াতে বেরিয়ে এসব বোলচাল! পারেও বটে।

জঙ্গলের পথে ছুটছে অ্যাম্বাসাডার। অবশ্য ছুটছে না বলে খোঁড়াচ্ছে বলাই ভাল। পথের হাল অতি অকহতব্য, বেশিরভাগ জায়গাতেই রাস্তা বলে কিছু নেই। পাহাড়ি মেটে পথ মাড়িয়ে লাফিয়ে গড়িয়ে এগোচ্ছে গাড়ি। ঝাঁকুনিতে দুপুরের খিচুড়ি ডিমভাজা গলায় উঠে আসার জোগাড়।

দু ধারে জঙ্গল এখন ভয়ংকর ঘন। সবে তিনটে সাড়ে তিনটে বাজে, অথচ কোথাও কোথাও যেন এখনই আঁধার নেমে গেছে। শাল পিয়াশাল সেগুন অর্জুন কেঁদ মহুয়ার ঠাস বুনটের মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ এক আধটা শিমুল অশোকও এসে পড়ে, সরে যায় আগুন ঝরিয়ে। অর্ণবের নির্দেশে যুধিষ্ঠির কখনও কখনও থামাচ্ছে গাড়ি, তখন চতুর্দিকে কী নিঃসীম নৈঃশব্দ্য। পাতার সামান্য খড়মড় আওয়াজেই একসঙ্গে চমকে তাকাচ্ছে ছ জোড়া চোখ। হয়তো একটা খরগোশ দৌড়ে গেল, কিংবা একটা কাঠবেড়ালি। কিন্তু ওইটুকুতেই যে কী গা ছমছম করা অনুভূতি!

আমার বই ডট কম
amarboi.com

অর্ণব সামনের সিটে টুকুসকে নিয়ে বসেছে। কাঁধে ক্যামেরা, হাতে বায়নোকুলার। পিছনে দিব্য আর মালবিকা, মধ্যিখানে ছবি। মালবিকা কথা বলছে না বিশেষ, চোখ বেশিরভাগ সময় জানলার বাইরে। তারা শেষ পর্যন্ত ঘাড়ে চাপল বলে মালবিকার কি ভাল লাগছে না?

বকবক করতে করতেই অর্ণব চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে কী যেন দেখছে। আবছায়া মাখা জঙ্গলে দৃষ্টি রেখেই বলল,—আপনি বোধহয় ডেসটিনেশান ঠিক না করে কোথাও যাওয়া পছন্দ করেন না, তাই না দিব্যবাবু?

—বা রে, পথে নামলে একটা গন্তব্য থাকবে না?

—না থাকলেই বা ক্ষতি কী? চোখ থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি নামাল অর্ণব। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল,—আপনি তো স্কুলে পড়ান?

—হুঁ।

—ছেলেমেয়েদের নিশ্চয়ই রচনা লিখতে দ্যান—তোমার জীবনের লক্ষ?

—কেন বলুন তো?

—দেখবেন শতকরা নব্বই জনই বিশাল বিশাল কিছু কথা লেখে। কেউ হতে চায় বৈজ্ঞানিক, কেউ অ্যাসট্রোনট, কেউ বা ভূপর্যটক। আলটিমেটলি তারা কিন্তু প্রায় সকলেই খুব সাধারণ কিছু একটা হয়। ডাক্তার মাস্টার উকিল ইঞ্জিনিয়ার গোছের কিছু। কিংবা আরও সাধারণ। কেরানি টেরানি। কিংবা কাঠবেকার। লুম্পেন।

—তো?

—এতে কী প্রমাণ হয়?

—তারা ভুলভাল লেখে। বানিয়ে বানিয়ে লেখে।

—কিংবা বাড়ির লোকের শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া কথা লেখে। ছবি ফুট কাটল, —ভাবে হয়তো ওই ধরনের লেখাটাই দস্তুর।

—হতে পারে। তবে আমার কিন্তু একটা অন্য থিয়োরি আছে। কিংবা বলতে পারেন আমি ব্যাপারটাকে অন্য ভাবে দেখি।

—কী রকম?

—আমার ধারণা, ওই ধরনের মহৎ কিছু...অ্যাটলিস্ট আনইউজুয়াল কিছু হওয়ার ইচ্ছে ছোটবেলায় আমাদের থাকে। এই ইচ্ছেটাকেই আমরা বলতে পারি ডেসটিনেশান। তবে এই ডেসটিনেশান শেষ পর্যন্ত আমাদের কোথাওই নিয়ে যায় না। আমরা গিয়ে পৌঁছোই সম্পূর্ণ একটা অন্য পয়েন্টে।

—তাই কী?

—শিওর।...দিব্যবাবু, বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, আপনি কি মাস্টার হতে চেয়েছিলেন ছোটবেলায়?

দিব্য ভাবার চেষ্টা করল। সেভাবে মনে পড়ে না। ঠিকঠাক কীই বা হতে চেয়েছিল সে? কবি? শিল্পী? বিপ্লবী?

অর্ণব উত্তরের অপেক্ষায় নেই। ফের বলল,—আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, ইওর এইম্ ওয়াজ এনিথিং বাট ইওর ওউন প্রফেশান। বলতে বলতে সহসা স্বর উদাস,—জানেন তো, আমার কী হওয়ার ইচ্ছে ছিল? মাউন্টেনিয়ার। পাহাড়ে উঠব, উঁচু উঁচু পিকগুলোকে স্কেল করব, অ্যান্ড ওয়ান ডে আই উইল বি অন দি টপ অফ মাউন্ট এভারেস্ট। ...শেষ পর্যন্ত কী হল জানেন? এখন এভারেস্ট ক্লিনিকে সপ্তাহে চার দিন করে বসি। হোয়াট অ্যান আয়রনি! হা হা হা।

দিব্য হাল্কা ভাবে বলল,—কিন্তু আপনার প্রফেসানে তো আপনি অনেক দূর উঠেছেন। সামডে হয়তো আপনি তার শিখরে আরোহণ করবেন।

—হ্যাহ্, দুধের বদলে চকের গুঁড়ো! অর্ণব নাক কুঁচকোল,—মিনিংলেস মশাই। অ্যাবসোলিউট মিনিংলেস। বাবা মার বাসনা পূরণ করতে কী যে একটা পেশায় ঢুকলাম! আমার রোগীগুলোও তো আবার পিকিউলিয়ার। বাইরে থেকে দিব্যি ঝকঝকে, কিন্তু আসল হৃদযন্ত্রটাই লঝ্ঝরে। টপাটপ টাঁসছে। ভাল্লাগে!

কথার মাঝেই টুকুস আচমকা চেঁচিয়ে উঠেছে,—বাবা হরিণ! বাবা হরিণ!

ঘ্যাচাং ব্রেক কষল যুধিষ্ঠির। জঙ্গল একটুখানি ফিকে হয়েছে, এবং সেখানে সত্যিই চার চারখানা হরিণ চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে। কী অপাপবিদ্ধ মুখ! কী অপরূপ মায়াবী চোখ!

সন্তর্পণে গাড়ি থেকে নেমে পটাপট ক্যামেরার শাটার টিপল অর্ণব। হরিণগুলো দূর থেকে দেখছিল মনুষ্যকুলকে, অবাক চোখে। হঠাৎই পিছন ফিরে দুদ্দাড়িয়ে ধাঁ। বোধহয় তাদের নিরালা পৃথিবীতে দুপেয়ে অনুপ্রবেশকারীদের তেমন পছন্দ হল না।

শুধু টুকুস নয়, ছবিও দারুণ পুলকিত। মুগ্ধ স্বরে বলল,—একেই

বুঝি বলে সোনার হরিণ!

অর্ণব হাসতে হাসতে বলল,—দেখবেন ম্যাডাম, আপনার রামচন্দ্রকে যেন এই হরিণ ধরে আনতে বলবেন না। বনেবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে হয়রান হবে বেচারা।

ছবি খিলখিল হেসে উঠল।

আবার চলতে শুরু করেছে গাড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হল জঙ্গলটা, এসে গেছে এক জনপদ। বেশ কয়েকটা কুঁড়েঘর দেখা যায়। একআধটা দোকানপাটও। আছে পাকাবাড়ি, স্কুলও। আদিবাসী বাচ্চারা ধুলোকাদা মেখে ফুটবল খেলছে স্কুলের মাঠে।

একটা তেমাথার মোড়ে গাড়ি দাঁড় করাল যুধিষ্ঠির,—স্যার, টুলকা এসে গেছি।

টুলকা নামটা দিব্যর শোনা। সাতকোশিয়ার জঙ্গলে ট্যুরিস্ট স্পটের কমতি নেই। লবঙ্গি বাঘমুণ্ডা, পুরানাকোট...। টুলকাও সেরকমই একটা জায়গা। কী যেন একটা দর্শনীয় স্থান আছে এখানে। কী যেন? কী যেন?

হঠাৎই মনে পড়েছে দিব্যর। অর্ণবকে বলল,—টুলকায় একটা ওয়াটার ফল আছে না?

—ইয়েস স্যার। ওই জলপ্রপাতটি দর্শন করানোই আজ আপনাদের বিবাহবার্ষিকীর উপহার। আমার তরফ থেকে। ...কী হে যুধিষ্ঠির, তোমার ভীমঝোরা এখান থেকে কদ্দূর?

—এক কিলোমিটার মতো হবে। তবে দুটো রাস্তা আছে স্যার। ডান দিকে গেলে ঝোরার নীচটায় পড়ব, বাঁয়ে গেল মাথায়।

দিব্য বলল,—ওপরটাতে গেলেই তো ভাল হয়। কাছ থেকে পড়াটা দেখব।

—নট এ ব্যাড আইডিয়া। মাথাতেই চড়ো যুধিষ্ঠির।

গাড়ি স্টার্ট দিতেই সামনে আবার একখানা জংলা পাহাড়। গোঁ গোঁ শব্দ তুলে উঠছে অ্যাম্বাসাডার, চড়াই ভেঙে। খানিকটা পাকদণ্ডী মেরে থামল।

ডাইনে হাত দেখিয়ে যুধিষ্ঠির বলল,—গাড়ি আর যাবে না স্যার। এবার বাকিটা হাঁটতে হবে। ফরেস্টের ভেতর দিয়ে।

—কতটা?

—বেশি দূর নয়। জোর মিনিট দশেক।

নেমে পড়েছে সকলে। জঙ্গল চিরে সরু শুঁড়িপথ, আঁকাবাঁকা। লাইন করে চলতে শুরু করল দিব্যরা। অর্ণব স্বঘোষিত দলপতি, সে আছে আগে আগে। টুকুসের উৎসাহ সবচেয়ে বেশি, অপ্রশস্ত রাস্তা ধরে প্রায় ছুটছে সে। তার পিছন পিছন ছবিও। কালকের মান অভিমান ভুলে ছবি যেন এখন টুকুসের মতোই ছেলেমানুষ। লাফাতে লাফাতে চলেছে।

দিব্য সামান্য পিছিয়ে পড়েছিল, এক জায়গায় এসে থমকে গেল। চারদিকটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে না। হল কী ছবির? মাঝে মাঝে গলা পাওয়া যাচ্ছিল এতক্ষণ, কথা বলছিল টুকুস অর্ণবের সঙ্গে, আর তো কোনও সাড়াশব্দ নেই? দু ধারে গাছগাছালি তেমন লম্বা নয়, তবে বেজায় ঘন, হাত দশ বারোর বেশি তো দৃষ্টিও চলে না! সামনে পায়ে চলা পথ তিন ভাগ হয়ে গেছে, ওরা গেল কোন দিকে? ছবি অর্ণবদের সঙ্গেই আছে তো? দিব্য নিজেই বা এখন কোন পথে এগোবে?

আমার বই . কম
amarboi.com

সহসা পিছনে মালবিকার কণ্ঠস্বর,—কী হল? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?

দিব্য উৎকণ্ঠা লুকোতে পারল না। তাকাচ্ছে ইতিউতি,—ছবিরা যে কোথায় উঠে গেল!

—সামনেই আছে নিশ্চয়ই। চলো। এগোও।

—কিন্তু.। ওদের কারুর...গলা পাচ্ছি না...! ছবি তোমার বরদের থেকে আলাদা হয়ে যায়নি তো?

—এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? মালবিকা পায়ে পায়ে সামনে এল। এক ফালি তির্যক হাসি হেনে বলল,—এটুকু জঙ্গলে কেউ হারায় না দিব্য।

—জানি। কিন্তু ছবি যদি একলা হয়ে যায়...

—কী হবে? তোমার বউকে বাঘে খেয়ে নেবে? আমার টুকুস

পর্যন্ত বুক ফুলিয়ে ঘুরছে...

—ছবি যে বড্ড ভীতু।

—সে ভীতু? নাকি তোমারই বেশি হারাবার ভয়?

দিব্য ঝলক দেখল মালবিকাকে। চোখদুটো কি জ্বলছে একটু?

মালবিকাই ফের বলল,—পোজ মেরে দাঁড়িয়ে থেকো না। হাঁটো।

—কিন্তু কোন রুটটা নেব? দিব্য অসহায় ভাবে বলল,—দ্যাখো না, রাস্তা তো এখানে তিনটুকরো। সোজাটা ধরব? নাকি...?

—তুমি তো সোজা পথেরই মানুষ দিব্য। অ্যাট লিস্ট আমি তোমাকে যতটা চিনতাম।

এবার আর শ্লেষটা পুরো হজম করতে পারল না দিব্য। কষটে গলায় বলল,—আমি এখনও সোজা পথেই চলি মালা। চাতুরি দিয়ে কাউকে ছলনা করা আমার ধাতে নেই।

—তাই বুঝি? মালবিকা গোমড়া হয়ে গেল,—তাহলে এত ভয় কিসের? সোজাই চলো।

মাঝের রাস্তাটাই ধরল দিব্য। হাঁটছে। অতি সতর্ক পায়। কান খাড়া রেখে।

মালবিকা হাঁটছিল পাশে পাশে। হঠাৎই জিজ্ঞেস করল,—ছবিকে আমার গল্প করেছ?

দিব্য চোখের কোণ দিয়ে তাকাল,—তুমি তোমার বরকে বলেছ? আমার কথা?

—আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। বলেছ বউকে?

—না।

—কেন বলোনি? তুমি না স্ট্রেট ফরোয়ার্ড? সত্যিটা জানাতে তোমার দ্বিধা কিসের?

—কী বলব? তুমি আমায় ল্যাং মেরে কেটে পড়েছ?

—নয় তাই বলতে। আমার সম্পর্কে যা প্রাণ চায় নিন্দেমন্দ করতে। নিজেকে ট্র্যাজিক হিরো সাজাতে।

—প্রয়োজন মনে করিনি।

—নাকি সাহসে কুলোয় নি? পাছে ছবি জেনে ফেললে সম্পর্কে একটা কাঁটা এসে যায়?

—তাও বলতে পারো। ছবি বড় বেশি সরল। জানলে কষ্ট তো পাবেই।

—স্ট্রেঞ্জ! তুমি যে এখন পুরনো বান্ধবীকে কন্টিনিউয়াসলি অ্যাভয়েড করে যাচ্ছ, তাতেও তার মনে কোনও খটকা জাগে না?

—বললাম তো, ছবির মনে প্যাঁচ নেই। সে মোটেই সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত নয়।

—বুঝেছি। তুমি এখন ছবিতে মজে আছ।

—সেটাই কি স্বাভাবিক নয়?

—মনকে চোখ ঠেরো না দিব্য। তুমি এখনও আমায় ভুলতে পারোনি।

—হুঁহ্, ওই ভেবেই তুমি সুখ পাও।

—বাজে বোকো না। তোমার চোখ বলে দিচ্ছে, তোমার এক্সপ্রেশান বলে দিচ্ছে, তোমার ছোঁয়া বলে দিচ্ছে...এমনকি তোমার মিথ্যে কথাও বলে দিচ্ছে...

—কী মিথ্যে বললাম?

—তুমি যে প্রেম করে বিয়ে করেছ, সেটাই তো আমার কাছে লুকোতে চেয়েছ। চাওনি? এই লুকোতে চাওয়ার মানে কী?

দিব্য চুপ হয়ে গেল। শুঁড়িপথের বাঁক ঘুরল নীরবে। দু পাশ থেকে গাছের ডাল এসে পড়ছে গায়ের ওপর, এগোচ্ছে সরিয়ে সরিয়ে। মালবিকার কথাগুলোকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি? দিব্য কি এ কথা অস্বীকার করতে পারে, এতদিন পর হঠাৎ এই জঙ্গলে মালবিকাকে দেখে সে সত্যিই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল? সাময়িক বিবশ দশাই তাকে ঠেলে দিয়েছিল পিছনের পায়ে? সাময়িক কেন, বিহ্বলতার ঘোর কি এখনও কেটেছে পুরোপুরি? নইলে কেন জোর গলায় বলতে পারছে না

সে সত্যিই ছবির প্রেমে পড়েছিল? মালবিকাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েই?

কী প্রমাণ করতে চায় দিব্য? মালবিকা বেইমানি করলেও সে তার নিষ্ঠায় সৎ থেকেছে? কী নির্বোধ ভাবনা! এতে মালবিকার অহং হয়তো তৃপ্ত হবে, কিন্তু দিব্যর তাতে কী আসে যায়? বরং মালবিকা তাকে একদিন যে অপমানটা করেছিল, সেটাই তো আজ ফিরিয়ে দিতে পারে মালবিকাকে। নয় কী?

আশ্চর্য, সব কিছু জেনে বুঝেও কেন যে দিব্যর মুখে কথা সরছে না? কেন যে পিন ফুটিয়ে চুপসে দিতে পারছে না মালবিকার দম্ভের বেলুনটাকে?

মালবিকা ফের খোঁচাচ্ছে দিব্যকে,—কী, গুম হয়ে গেলে যে?

দিব্য বড় করে একটা শ্বাস ফেলল,—একদম সত্যি কথাটা শুনবে?

—বলো। শুনি।

—আমি কখনই বলব না তোমাকে কাল দেখে আমি একটুও বিচলিত হইনি। দিব্য গলা ঝাড়ল। হাঁটতে হাঁটতে বলছে কথা, ঈষৎ দুলছে কণ্ঠস্বর,—তবে এ কথাও ঠিক, তুমি আমার কাছে অনেক আবছা হয়ে এসেছিলে। সত্যি বলতে কি, তোমাকে আর সেভাবে মনেও পড়ত না। শোক বেদনা জ্বালা, এসব তো চিরকাল আঁকড়ে যায় না। থাকেও না মনে। চেষ্টা করলেও থাকে না। আপনাআপনি মনের ওপর পলি জমে, আপনাআপনিই ধূসর হয়ে আসে। তখন যা পড়ে থাকে তা শুধুই স্মৃতি। অ্যালবামের ফটোর মতো। ক্বচিৎ কখনও অবসর সময়ে মানুষ যা উল্টেপাল্টে দেখে। যদি নতুন কোনও ঝড়ঝাপটা না আসে, সেই স্মৃতিও বিবর্ণ হয় ক্রমশ। আমার দুর্ভাগ্য, রংটা পুরোপুরি জ্বলার আগে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। হয়তো ওই ক্ষণিক দুর্বলতাই আমাকে প্ররোচিত করেছিল...

শেষের কথাটা যেন শুনতেই পেল না মালবিকা। খপ করে চেপে ধরেছে দিব্যর হাত। আহত স্বরে বলল,—আমার সঙ্গে এই দেখা

হওয়াটা তোমার দুর্ভাগ্য?

দিব্য হাত ছাড়াল না। দাঁড়িয়ে পড়েছে। মৃদু গলায় বলল,—দুর্ভাগ্য তো বটেই। আমরা যে যার মতো জীবন খুঁজে নিয়েছি...অথচ একসময়ে এই আমিই...তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, তোমার প্রত্যাখ্যানের পর আমি প্রথমটা রাগে অন্ধ হয়ে গেছিলাম। খ্যাপা কুকুরের মতো মনে মনে গজরাতাম, তোমাকে যেখানেই পাব, সেখানেই তোমাকে অ্যাটাক করব। মুখে অ্যাসিডবাল্‌ব ছুঁড়ে মারব। খতম করে দেব তোমার ফিউচার। ধ্বংস করে দেব তোমার রূপ। আবার একইসঙ্গে একটা জ্বালাপোড়াও ছিল। অপমানের। হীনমন্যতার। ভাবতাম, নিজের জীবনটাই শেষ করে দিই না কেন! গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ি, ট্রেনের সামনে ঝাঁপ মারি, কিংবা এক গাদা স্লিপিং পিল গিলে কালঘুমে তলিয়ে যাই। আশ্চর্য, দুটোর কোনওটাই করা হল না। বরং আস্তে আস্তে ছটফটানিটা মরে এল। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলাম, তুমি একদিক দিয়ে আমার উপকারই করেছ। প্রেম ভালবাসার পরেও কোনও মেয়ে যদি পিছিয়ে যায়, বুঝতে হবে ছেলেটার মধ্যেই কোথাও একটা খামতি আছে। মেয়েটার চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা ছেলেটার নেই। মে ইট বি মানি, মে বি সিকিউরিটি, এনিথিং। বিশ্বাসের অভাব থেকে কোনও দাম্পত্য শুরু হলে কদিনেই কি সেটা বিষিয়ে যেত না? দুটো চারটে মধুর স্মৃতিও তখন মন থেকে মুছে যেত। দিব্য লম্বা একটা শ্বাস ফেলল,—তার চেয়ে তো এই ভাল। আমি আমার মতো করে আমার ছবিকে খুঁজে নিয়েছি, তুমিও দিব্যি সুখে ভরপুর হয়ে ডাক্তার বরের সঙ্গে ঘর করছ।

এবার মালবিকাই ছেড়ে দিয়েছে হাত। সামান্য তফাতে সরে গেল। একটু যেন উদাস। বুঝি বা বিষণ্ণও। নিবিড় বনানীর দিকে চোখ রেখে বলল,—কী করে বুঝলে আমি খুব সুখী?

—দেখেই বোঝা যায় মালা। কোনও কিছুরই তো অভাব নেই তোমার। নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবন, টুকুসের মতো লাইভ্‌লি বাচ্চা,

আমার বই . কম
amarboi.com

অর্ণববাবুর মতো দিলখোলা হাজব্যান্ড...

—অ্যাপারেন্টলি ওরকম অনেক কিছুই মনে হয় দিব্য। দেখে তো মনে হয় সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, কিন্তু তাই কি সত্যি?

—তুমি সুখী নও?

—কী জানি! হয়তো সুখী। হয়তো সুখী নই। বুঝতে পারি না। অনুভূতিগুলো কেমন বোদা মেরে গেছে। আবার হাঁটা শুরু করল মালবিকা, অবিন্যস্ত পায়ে। যেন নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছে এভাবে বিড়বিড় করে উঠল,—অর্ণবের দিন সপ্তাহ মাস বছর সব চলে তার নিজস্ব ঘড়ির কাঁটায়। শুধু এই কালেভদ্রের ছুটিটুকু ছাড়া। দিনভর তো তার দেখাই পাই না। রাতে হা-ক্লান্ত হয়ে ফিরল...তখন তার কথা বলারও উৎসাহ নেই, কোনক্রমে নাকেমুখে গুঁজে বিছানায়। কিংবা ফের কোনও রাতের কলে। আর রবিবারগুলোয় আছে ক্লাব পার্টি, নিজস্ব হৈ-হল্লা। আমি তো তার পাশে জাস্ট একটা অস্তিত্ব, ডক্টর রায়ের মিসেস, তার বেশি কিছু নই। কিংবা তার সংসারের খুঁটিনাটি দেখার যন্ত্র। সংসারটা যে দুজনের, টাকা রোজগার ছাড়াও যে সেখানে অর্ণবের আরও কিছু ফাংশান আছে, এই বোধটাই অর্ণবের নেই। পাশাপাশি বিছানায় শুই বটে, তবে তার সঙ্গ পাই কতটুকু! একসঙ্গে থাকার সময়ে মানুষ তো দুটো চারটে অপ্রয়োজনীয় কথাও বলতে চায়...

মালবিকা আপনমনে বলেই চলেছে। শুনতে শুনতে দিব্যর মনের গহনে যেন একটা গোপন পুলক জাগছিল। যে অবদমিত প্রতিশোধস্পৃহাটা বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছিল, সে যেন আবার ঝিমিয়ে পড়েছে। এই অতৃপ্ত নারীকে আর আঘাত করে কী লাভ! বরং মালবিকার ওপর এখন একটু মায়াই জাগছে। নাকি করুণা?

শুঁড়িপথ শেষ। পাহাড়ের মাথায় অনেকটা খোলা জায়গা। এবড়ো খেবড়ো পাথুরে চাতাল। আরও কোনও উঁচু পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসছে ক্ষীণ জলধারা, চাতাল বেয়ে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে পাহাড়ের প্রান্তে। সেখান থেকে খাড়া লাফিয়ে পড়ছে নীচে।

দিব্য পাহাড়ের কিনারে এসে দাঁড়াল। নীচটা ভারী মনোরম, গাছে গাছে ঘেরা ছোট এক ফালি বনভূমি, টলটলে জলাশয়...। শেষ বিকেলের আলো সরাসরি পৌঁছোচ্ছে না, সেখানে এখন মায়াবী আবছায়া। কোমল এক বিষণ্ণতায় যেন ডুবে আছে জায়গাটা। একেবারে নিঝুম। নিস্তব্ধ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুক ঠেলে যেন কান্না উঠে আসে।

হঠাৎই দৃশ্যটা ছিঁড়ে গেল। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে কে বেরিয়ে আসছে? ছবি না? টুকুসও আছে সঙ্গে। দুজনে হাত ধরাধরি করে জলাশয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। জলে হাত ছোঁয়াচ্ছে।

মালবিকাও দেখেছে ছবিদের। অস্ফুটে বলে উঠল,—ওই তো..ওই তো ওরা।

দিব্য বলল,—হুঁ।

—এবার নিশ্চিন্ত হয়েছ তো? এখন বাঘে খেলে শুধু তোমার ছবিকে নয়, আমার টুকুসকেও খাবে।

আমার বই . কম
amarboi.com

—হুঁ।

—কী হুঁ হুঁ করছ? ডাকো ওদের। জানান দাও আমরা এখানে আছি।

—থাক না, তাড়া কিসের! দিব্যর গলা বুজে এল,—তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব মালা?

—কী?

—আর হয়তো কোনও দিন দেখা হবে না। হয়তো এই শেষ...। আমরা তো এতক্ষণ শুধু ক্ষোভ দুঃখই উগরে গেলাম...একটা মধুর স্মৃতি দিয়ে যাবে আমাকে?

মালবিকা স্থির হয়ে গেল। দিব্যকে দেখছে নিষ্পলক। শেষ সূর্যের আলো এসে পড়েছে পাহাড়ের মাথায়, সোনালি রোদে জ্বলজ্বল করছে মালবিকার মুখ। গভীর কালো চোখের তারায় সেই পুরোনো আমন্ত্রণ।

দিব্য পায়ে পায়ে মালবিকার কাছে এল। দু হাতে চেপে ধরেছে

মালবিকার কাঁধ। ঠোঁট ডুবিয়ে দিল উন্মুখ ঠোঁটে। টের পেল মালবিকাও তাকে জড়িয়ে ধরছে। সাপিনীর মতো নয়, শালগাছে জড়িয়ে থাকা বুনো লতার মতো।

পলকের জন্য দিব্যর মনে হল মুহূর্তটা যদি অনন্ত হত!

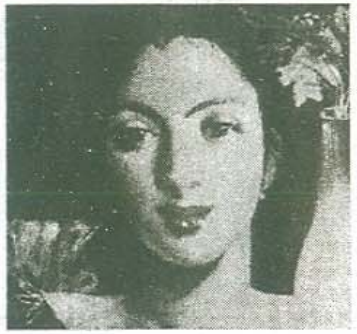

৭

আমার বই . কম

কাঠকুটো জড়ো করে লনের এক ধারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে দুর্যোধন। তিনখানা বাঁশের টুকরো কোনাকুনি দাঁড় করিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে মাথা। লোহার আংটা ঝুলছে মাথা থেকে। আংটায় গাঁথা আছে ছাড়ানো মুরগি। নুন মশলা মাখানো। ঝলসানো মুরগি দিয়ে নৈশভোজ সারা হবে আজ।

আয়োজনটা দুর্যোধনের হলেও বার-বি-কিউ-এর পরিকল্পনাটা অবশ্যই অর্ণবের। আজ নাকি অর্ণব রায়ের আদিম মানুষ হওয়ার সাধ জেগেছে! এবং তার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে হবে বাকিদেরও! খেলা।

টুলকাতেও আজ জোর খেল দেখাল বটে অর্ণব। ভীমঝোরা দেখতে গিয়ে পুরো ভ্যানিশ। বাংলোর মাথায়, পাহাড়ের নীচে, কোথ্থাও নেই। মালবিকা ছবি আর দিব্য তোলপাড় করে ফেলল চারদিক, টুকুস বাবা বাবা করে চেঁচাচ্ছে, হাঁকাহাঁকির ঠেলায় উড়ে যাচ্ছে

বনের পাখপাখালি, তবু অর্ণবের সাড়া নেই। জঙ্গলের মধ্যে অর্ণবের নানারকম উদ্ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা দেখে দেখে মালবিকা মোটামুটি অভ্যস্ত, তারও মুখ শুকিয়ে আমসি। কোনও দুর্ঘটনা ঘটে গেল না তো?

যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে ফের খুঁজতে যাবে বলে গাড়িতে ফিরছিল মালবিকারা, গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে অবাক। সিটে বসে ঝিমোচ্ছে অর্ণব!

উত্তেজিত মুখে মালবিকা বলেছিল,—কী কাণ্ড, তুমি এখানে! আর এদিকে আমরা তোমায় গরুখোঁজা খুঁজছি।

—চলে এলাম। পায়ে একটা ক্র্যাম্প ধরেছিল।

—তো জানিয়ে আসতে কী হয়?

—কাকে জানাব? তোমরা তো যে যার মতো হারিয়ে গেলে।

ছবি আক্ষেপের সুরে বলল,—ইশ, ভীমঝোরার নীচটায় আপনার যাওয়া হল না। কী অপরূপ স্পট!

—কী আর করা যাবে ম্যাডাম। অর্ণব কাঁধ ঝাঁকাল,—দুনিয়ায় কত কিছুই তো আমার অদেখা ছিল। ভবিষ্যতেও হয়তো থাকবে। সামান্য একটা ওয়াটার ফলের জন্য আফশোস করে কী লাভ!

অর্থাৎ জব্বর চোট। নাহলে অমন কথা বলার লোক তো অর্ণব রায় নয়!

মালবিকা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল,—এখন কেমন ফিল করছ?

—বেটার। মাচ বেটার।

—হঠাৎ ক্র্যাম্প্‌টা হল কী করে?

—কী জানি! বেশি বেভুল হয়ে হাঁটছিলাম বোধহয়।

—রুমে পেনকিলার আছে, গিয়েই খেয়ে নেবে।

এর পর আর কোথাও যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। জঙ্গল ভেদ করে সোজা বাংলো। গাড়ি থেকে নেমেই প্ল্যানটার কথা ঘোষণা করে দিল অর্ণব। আপাতত এক ঘণ্টার ব্রেক, তারপর বসবে নৈশআসর, ছবি

এবং দিব্যর উপস্থিতি সেখানে একান্ত প্রার্থনীয়। প্রস্তাব শুনে ছবি তো মহা খুশি, দিব্যরও খুব একটা আপত্তি নেই বলেই মনে হল, আর টুকুস তো যথারীতি নাচছে তিড়িংবিড়িং।

মুখ হাত ধুয়ে পোশাক বদলানোর পর টুকুসের অবশ্য সে দম আর রইল না। টোস্ট ওমলেট আর প্যাকেটের ফ্লেভারড মিল্ক খেয়েই সে নাক ডাকাতে শুরু করেছে ভোঁসভোঁস। মশারি টাঙিয়ে তাকে শুইয়ে দিল মালবিকা। পৌনে আটটা বাজে, দিনভর যথেষ্ট হুটোপুটি করেছে টুকুস, পেটেও কিছু পড়ল, এখন নিজে থেকে না জাগলে তাকে আর তুলে খাওয়ানোর দরকার নেই।

তা লোককে বিশ্রাম নেওয়ার কথা অর্ণব বলল বটে, কিন্তু নিজে সে আদৌ জিরোল কী! মুখে একখানা ট্যাবলেট ফেলে পাঁচ মিনিটও বোধহয় গড়াল না বিছানায়। উঠে পড়ে হাঁকডাক, দুর্যোধন, ইধার আও। ...যুধিষ্ঠির, কোথায় গেলে বাছাধন! দুর্যোধন তো এখন ভক্ত হনুমান, সাহেবের হুকুম তামিল করার জন্যে এক পায়ে খাড়া। যুধিষ্ঠিরও হাত লাগাল তার সঙ্গে। বাঁশ বাঁধাবাঁধি, আংটা জোগাড়, আগুন জ্বালানো, মুরগি-ড্রেসিং, চেয়ার টেবিল টানাটানি, লন সাজিয়ে ফেলা, সবই হয়ে গেল ঝটাপট।

সেই সাজানো মেহফিলে এখন বসেছে মালবিকারা। অদূরের নিবিড় আঁধার এগিয়ে এসেও থমকে আছে লনের ওপারে। বারান্দায় জ্বলছে হলদেটে বাতিটা, তার ক্ষীণ দ্যুতি রচনা করেছে আলোছায়া। কাঁপছে আলো, কাঁপছে ছায়া। আগুনের তালে তালে।

অর্ণব একটুক্ষণের জন্য ঘরে গিয়েছিল, ফিরল হুইস্কির বড় বোতলটা নিয়ে। কাল সামান্যই খেয়েছিল, প্রায় পুরো পানীয়ই মজুত এখনও। ঠক্ করে বোতল টেবিলে রেখে হেলান দিয়েছে চেয়ারে। সিগারেট ধরাচ্ছে। লাইটারে বাজনা বেজে উঠল টুংটাং।

মালবিকা টেবিলের উল্টো প্রান্তে। কোনাকুনি। পাশে ছবি। মালবিকার ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি,—বোতলই তাহলে ডাক্তারবাবুর

আমার বই . কম
amarboi.com

প্রিমিটিভ ম্যান হওয়ার প্রথম ধাপ?

অর্ণব যেন শুনেও শুনল না। টেরচা চোখে দিব্যকে বলল,—কী মশাই, সুরায় অরুচি নেই তো?

দিব্য ঢোক গিলছে,—আমি তো...তেমন একটা...

—তার মানে খান? কভি কভি? আর ম্যাডাম, আপনি?

—ওরে বাবা, আমি না। ছবি সভয়ে ঘাড় নাড়ল,—আমি জীবনে খাইনি।

—আমরাও কি পেট থেকে পড়ে খাচ্ছি? ...আজ একটা স্পেশাল ডে, একবার টেস্ট করে দেখুন না।

দিব্য হাল্‌কা গলায় বলল,—চাখতেই পারো। অসুবিধের কী আছে?

ছবি নার্ভাস মুখে মালবিকার দিকে তাকাল। মালবিকা হাত রাখল ছবির পিঠে,—কী আছে, একদিন তো। আমিও তো নেব।

তবু ছবি যেন সিঁটিয়ে আছে।

অর্ণব গলা ছাড়ল, —দুর্যোধন..? গ্লাস দিয়ে যাও। আর জল।

দুর্যোধন নয়, যুধিষ্ঠির ছুটে এসে দিয়ে গেল সব সরঞ্জাম। গ্লাসে গ্লাসে পানীয় ঢালল অর্ণব। জল মেশাল মাপ মতো। ধরিয়ে দিল হাতে হাতে। নিজের গ্লাস শূন্যে তুলে বলল,—চিয়ার্স।

দিব্যও হাত তুলল,—চিয়ার্স।

অর্ণব চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে। দিব্য মুচকি হেসে বলল,—একটা কথা বলব অর্ণববাবু? এই হুইস্কি টুইস্কিতে প্রিমিটিভ হওয়া যায় কী?

—মহুয়া খাবেন? এক্ষুনি তাহলে যুধিষ্ঠিরকে ফিট করে দিই।

—রক্ষে করো। মালবিকা হাঁ হাঁ করে উঠেছে,—খবরদার না। ওসব আজে বাজে জিনিস একদম নয়। যা শিক্ষা হয়েছে একবার!

—আপনি মহুয়া খেয়েছেন, মালবিকাদি?

—আর বোলো না। আমার এই বরের পাল্লায় পড়ে গিলতে হয়েছিল। বেতলায়। কী বিচ্ছিরি কষটে স্বাদ! জিভে ঠেকানো মাত্র মনে

হল নাড়িভুঁড়ি গুলিয়ে গেল। বমি টমি করে সে এক কেচ্ছা। ...মহুয়া ফহুয়ার চেয়ে হুইস্কি বাবা ঢের ভাল।

ছবি গ্লাসে ঠোঁট ছুঁইয়েই মুখ বিকৃত করেছে,—এহ্, এও তো যেন কেমন কেমন! কী ঝাঁঝ!

—দু একটা সিপ দাও, ঠিক হয়ে যাবে। মালবিকা চেয়ারে হেলান দিল,—তা তোমাদের তো কাল সকালেই ফেরা, তাই না?

—সকাল নয়, বলুন ভোর। ছটায় বাস ছাড়বে। পাঁচটার মধ্যে রেডি হতে হবে।

—সাড়ে পাঁচটায় বেরোলেও হবে। দিব্য মন্তব্য করল,—বাসস্ট্যান্ড আর কতটুকু! মেরেকেটে আধ কিলোমিটার।

অর্ণবের প্রথম রাউন্ড শেষ। গ্লাসে ফের হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বলল,—আপনারা আমাদের সঙ্গেও ব্যাক করতে পারেন। ইওর জার্নি উইল বি মোর এনজয়েবল্।

—তা ঠিক। ঝাঁকুনি টাকুনি কম হবে, আঙ্গুলে গিয়ে বাস বদল করারও ঝঞ্ঝাট নেই।... কিন্তু?

আমার বই . কম
amarboi.com

—কিন্তু টা কীসের?

—ধৌলিতে ফিরব বলে সব ফিক্স করা আছে যে!

মালবিকা জিজ্ঞেস করল,—রিজার্ভেশান করা আছে? নাকি গিয়ে টিকিট কাটবে?

—গিয়েই কাটব।

—তাহলে আমাদের সঙ্গেই চলো। বেশ হৈ হৈ করতে করতে যাওয়া যাবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের সকলেরই আনন্দ হবে। অর্ণব ফোড়ন কাটল,—আপনার, আমার মিসেসের...আমারও।

কথার সুরটা কেমন যেন কানে লাগল মালবিকার। অর্ণবের মুখে কিন্তু কোনও ভাবান্তর নেই। পুরো গ্লাস গলায় ঢেলে আবার বোতলের দিকে হাত বাড়িয়েছে। এবার আর জলও মেশাল না, সোনালি তরল

সরাসরি চালান করল মুখে।

মালবিকা ভুরু কুঁচকোল,—এ কী, তুমি নিট খাচ্ছ?

—তো? কী হয় খেলে?

—নেশা চড়ে যাবে।

—তো?

—তো আবার কী! অসুস্থ হয়ে পড়বে।

—হাহ্, অর্ণব রায় হুইস্কি খেয়ে কখনও অসুস্থ হয় না।

মালবিকা হাত উল্টে দিল,—যা খুশি করো।

অর্ণব কর্ণপাতই করল না আর। হাসি হাসি মুখে দিব্যর দিকে তাকিয়েছে—তাহলে কী স্থির হল? আপনারা আমাদের গাড়িতে যাচ্ছেন তো?

—যেতে পারলে তো ভালই লাগত। দিব্য ঝলক মালবিকাকে দেখে নিয়ে বলল,—কিন্তু পরশু আমার স্কুল আছে যে।

—ভেবে দেখুন আমাদের সঙ্গ পাওয়ার লোভে স্কুল কামাই করা যায় কিনা।

ছবি বলল,—না না, ওদিন আমাদের যেতেই হবে। পরশু সকালে বহরমপুর থেকে আমার ননদের আসার কথা আছে। তাছাড়া কাজের মেয়েটা এসে ফিরে যাবে, দুধওয়ালা এসে তালাবন্ধ দেখবে...

—ওমা, তুমিও তো দেখছি সংসারী কম নও!

—বিয়ের এক বছর পুরে গেল মালবিকাদি, এখন তো একটু সংসার দেখতেই হবে।

কথা চলছে টুকটাক। ছবির ঘরসংসার নিয়ে। মালবিকার ঘরগৃহস্থালি নিয়ে। তারই মাঝে দুর্যোধন গরম গরম পকোড়া রেখে গেছে, কথার সঙ্গে মুখও চলছে সকলের। অর্ণব একবার হাঁক পেড়ে জেনে নিল মুরগির হাল কী রকম, রাতের জন্য বড় করে স্যালাডও বানাতে বলল দুর্যোধনকে, তারপর আবার চুমুক দিয়েছে হুইস্কিতে। আবার পানীয় ঢালার জন্য বোতল হাতড়াচ্ছে।

মালবিকার ভুরু জড়ো হচ্ছিল ক্রমশ। অর্ণব কি আজ একটু বেশি পান করছে না? দিব্য তো মাত্র দ্বিতীয় বার নিয়েছে, এর মধ্যে পঞ্চম রাউন্ড হয়ে গেল অর্ণবের। খাই খাই করছে, মুরগি ঝলসানোয় এত উৎসাহ, আদৌ শেষে খেতে পারবে তো?

একসময়ে মালবিকা বলেই ফেলল,—অ্যাই, এবার একটু রয়ে-সয়ে খাও।

—আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমার নেশা হয়নি। অর্ণবের স্বর জড়িয়ে গেছে বেশ,—কী দিব্যবাবু, আমাকে কি মাতাল মনে হচ্ছে?

দিব্য মুখ টিপে হাসল,—মোটেই না। স্টেডি আছেন তো।

—গুড। গুড।

—আপনি হলেন গিয়ে রসিক মানুষ, সোমরসে আপনার কী করবে!

—আপনি কিন্তু মশাই মহা বেরসিক। অ্যান্ড আনগ্রেটফুল টুউ।

—কেন? কী করলাম?

—আপনাকে আজ কেমন একটা তোফা উপহার দিলাম, সেটা তা কই বলছেন না!

আমারবই.কম
amarboi.com

—আপনি কি ভীমঝোরার কথা বলছেন?

—আমি সব ঝোরার কথাই বলছি মশাই।

—মানে?

—কিছু বুঝছেন না, তাই না? ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানেন না! খ্যাকখ্যাক হাসছে অর্ণব। বেসুরো গলায় গেয়ে উঠল,—ঢুকুঢুকু ঢুকুঢুকু, জানতি পারে না কোনও মুখ্খু...

দিব্য থতমত। মালবিকাও। পলকের জন্য দিব্যর সঙ্গে চোখাচোখি হল মালবিকার। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে দিব্য। দেখছে ছবিকে। মুখে একটা পকোড়া তুলে থমকে আছে ছবি, কামড়াচ্ছে না।

অর্ণবের মুখের অর্ধেকটা ছায়ায় ঢাকা। চেষ্টা করেও অর্ণবকে পড়তে পারছিল না মালবিকা। কী বলতে চায় অর্ণব? দিব্যর ওপর কি

কোনও সন্দেহ জেগেছে?

কয়েক মুহূর্ত সকলেই চুপচাপ। পরিবেশ থমথমে। ফাল্গুনের মৃদুমন্দ বাতাস যেন স্থির সহসা। দূরে কোথাও একটা রাতচরা পাখি ডেকে উঠল। ডেকেই চলেছে। ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ...

অর্ণব আবার এক ঢোক হুইস্কি খেল। পিটপিট তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। স্খলিত গলায় বলে উঠল,—আরে বাবা, হলটা কী? এত সান্নাটা কেন? আমি কি বেফাঁস কিছু বলে ফেললাম?

মালবিকার বুক দুরুদুরু। প্রাণপণে তবু সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে,—আহ্, কী নাটক হচ্ছে! বিহেভ ইওরসেল্ফ।

—যাহ্ বাবা! রাধাকেষ্ট করবে লীলা, আর আয়ান ঘোষ বললেই বিলা!

—কী হচ্ছে কী অর্ণব? মাতলামি কোরো না। চুপ করো। প্লিজ...

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা, আর কিচ্ছুটি বলব না। মুখের সামনে হাত ঘুরিয়ে বিচিত্র মুদ্রা করল অর্ণব,—এই আমি মুখে তালা এঁটে দিলাম।

দু সেকেন্ড থুম্বো মুখে বসে থেকেই প্রতিশ্রুতি ভেঙে অর্ণব ফের সরব হয়েছে,—আচ্ছা দিব্যমশাই, আমাকে একটা ব্যাপার আপনি এক্সপ্লেন করতে পারেন? ...কাল দুপুরে আপনার বান্ধবীর সঙ্গে আপনার দেখা হল...স্কুলকলেজের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে লোকে কত খুশি হয়, এঁটুলির মতো সেঁটে যায়, সারাক্ষণ পুরোনো কথার ফুলঝুরি ওড়ে...আর আপনি কিনা তাকে দেখেই বিকেলে ফুড়ুৎ হলেন, সন্ধের পর আপনার মাথা ধরল, কাল থেকে একটি বারের জন্যও আমাদের দরজা মাড়ালেন না...এমনকি আমার মিসেসও ওদিকে না...। এটা কি ভেরি ভেরি দৃষ্টিকটু নয়?

দিব্যর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। একবার ছবিকে দেখছে, একবার মালবিকাকে। বড় করে ঢোক গিলে বলল,—আপনি কী বলছেন, আমি তো কিছুই...

—দেখুন মশাই, আমি হার্টের ডাক্তার। হার্টের প্রবলেম হলে

কিডনিটা আগে চেক করে নিই। কিডনির গড়বড় পেলে দেখি পা ফুলছে কিনা। অর্থাৎ কার্যকারণের সম্পর্ক খোঁজাটাই আমার পেশা। ...নদীতে স্নান করতে গিয়ে আপনার বান্ধবী আপনারই গায়ে ঢলে পড়ে, জঙ্গলে আপনারাই একসঙ্গে হারিয়ে যান...অথচ সামনাসামনি দেখা হলে এ নাক কুঁচকোচ্ছে, ও মুখ ভ্যাট্কাচ্ছে...। অর্ণব চোখ নাচাল,—এ সবের মানে কী, অ্যাঁ?

ছবির মুখভাব বদলে গেছে আমূল। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলে সে প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড়। মালবিকা মরিয়া হয়ে বলল,—এই...ছবি...তুমি কিছু মাইন্ড কোরো না। ড্রিংক করলে অর্ণব এরকমই উল্টোপাল্টা বকে। অন্যদের টরচার করে আনন্দ পায়। জাস্ট ইগনোর করো ওকে।

—মালবিকাদিদি আপনাকে সঠিক উপদেশই দিচ্ছে ম্যাডাম। ইগনোর করুন। একদম ভাবার চেষ্টা করবেন না আপনার বিবাহবার্ষিকীর দিন আপনার বর ভীমঝোরার মাথায় দাঁড়িয়ে আপনার মালবিকাদিদির সঙ্গে...যিনি দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ওয়াইফও বটেন... পুরোনো আশনাইটা ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন। ওহ্, কী দারুণ রোমান্টিক সিন। পাহাড়ের প্রান্তে ম্যান অ্যান্ড উওম্যান, চারধারে জঙ্গল, পাশ দিয়ে সরু ঝর্ণা কুলকুল বয়ে যাচ্ছে...বয়ে যাচ্ছে...বয়ে যাচ্ছে...

অর্ণবের গলা ডুবে গেল। মালবিকা বজ্রাহত। মুখ পাংশু। জিভ অসাড়। প্রতিবাদ করে যে থামাবে অর্ণবকে, সেই শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে স্নায়ু। অর্ণব তাদের দেখল কখন? পিছু নিয়েছিল কী? দিব্যকে নিয়ে সে এতটাই মত্ত ছিল যে টের পায়নি কেউ তাদের অনুসরণ করছে? এবার কী হবে? অর্ণব কি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলবে? ইশ, মুহূর্তের ভুলে এ কী সর্বনাশ ঘটিয়ে ফেলল সে? কী কুক্ষণে যে দিব্যর ওপর প্রেম জেগে উঠেছিল?

দিব্যর দিকে না তাকিয়েও মালবিকা বুঝতে পারছিল দিব্যর অবস্থাও তথৈবচ। ছবির কাছে সেই বা মুখ দেখাবে কী করে?

ঠিক তখনই সামনে দুর্যোধন,—স্যার, মুরগা রেডি। পরোটাও। সার্ভ করব?

হায় রে, কাকে বলছে দুর্যোধন? অর্ণব কি আর সজ্ঞানে আছে? দু চোখ বন্ধ তার, হেলে গেছে মাথা। চেয়ারেই বুঝি ঘুমিয়ে পড়ল।

ছবি উঠে দাঁড়িয়েছে। বাতাসকে শুনিয়ে বলল,—আমি ঘরে যাচ্ছি।

মালবিকা মিনমিন করে বলল,—তুমি খাবে না ছবি?

—না। আমার পেট ভরে গেছে।

—এত রান্নাবান্না করা হল...

—আপনারা খান। আপনি আর আপনার বন্ধু।

ছবি চলে গেল। অর্ণব অচৈতন্য। দিব্য আর মালবিকা বসে আছে মুখোমুখি। নির্বাক। নিথর। অরণ্যে অন্ধকার আরও গাঢ় হচ্ছিল।

৮

আমার বই . কম

রাতভর দু চোখের পাতা এক করতে পারেনি মালবিকা। পাশে অর্ণব ঘুমোচ্ছে অঘোরে, টুকুসও রাতে উঠল না একবারও, বাপ ছেলের মাঝখানে নিদ্রাহীন শুয়ে থাকা যে কী দুঃসহ! মনে হচ্ছিল রাতটা বুঝি আর কাটবেই না। এলোমেলো চিন্তা ঘুরপাক খায় মস্তিষ্কে, অচেনা শংকায় কেঁপে কেঁপে ওঠে বুক। তারই মাঝে জঙ্গল আরও নিঝুম হল। অপার্থিব নিস্তব্ধতায় ভরে গেল চরাচর। উঁহু, শেয়াল ডাকছিল। শুধুই শেয়াল? নাকি অন্য কোনও জন্তুও? যেই হোক না কেন, হঠাৎ হঠাৎ ডাকগুলো যেন এফোঁড় ওফোঁড় করে দিচ্ছিল মালবিকাকে। কেঁপে উঠছিল মালবিকা। ভয়ে গুটিয়ে যাচ্ছিল। অর্ণবকে যে ছোঁবে একটু, ডাকবে, মালবিকা সে সাহসটুকুও পাচ্ছিল না।

রাত্রিশেষটাও মালবিকা টের পেয়েছে স্পষ্ট। অন্ধকার মুছে একটু একটু ফুটল আলো, জাগল অরণ্য। অসংখ্য পাখিদের কিচিরমিচিরে

ভরে গেল দশদিক। বন্ধ ঘরেও ভোরের সৌরভ এসে ঝাপটা মারছিল মালবিকার নাকে। কোমল বাতাস গোপনে এসে মালবিকার মাথায় যেন হাত বোলাচ্ছিল।

শুয়ে শুয়েই মালবিকা শুনতে পেল দিব্যরা বেরিয়ে যাচ্ছে। দুর্যোধনকে কী যেন বলল দিব্য, সম্ভবত দুর্যোধন এগিয়ে দিয়ে এল ওদের, তারপর সশব্দে ওপাশের দরজায় তালা পড়ে গেল। ছবিকে কি একটু শান্ত করতে পারল দিব্য? হয়তো পারেনি। হয়তো পেরেছে। মালবিকার তাতে আর কী আসে যায়!

পাথরের মতো ভারী শরীরটাকে টেনে টেনে একসময়ে বারান্দায় এসে বসল মালবিকা। ফাঁকা চোখে দেখছে সামনের পাহাড়। কিংবা দূরে দৃশ্যমান এক ফালি নদী। কিংবা জঙ্গলের আভাস। কিংবা লন। কিংবা প্রজাপতিদের ওড়াউড়ি। পাখিদের ব্যস্ততা। আদতে কিছুই নয়। মস্তিষ্কই যদি শূন্য থাকে, চোখ তবে দেখে কী করে!

আচমকাই কাঁধে এক অতি চেনা স্পর্শ। মালবিকার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা চোরা স্রোত নেমে গেল যেন।

অর্ণব আলগা চাপ দিচ্ছে কাঁধে,—এত সক্কাল সক্কাল উঠে পড়েছ যে?

অর্ণবের স্বর একদম সহজ। স্বাভাবিক। মালিন্যহীন। শ্লেষহীন। তিক্ততাহীন। তবু মালবিকার আড়ষ্ট ভাব একটুও কাটল না। চুপ করে আছে।

অর্ণব ঘুরে সামনে এল। ঘাড় বেঁকিয়ে তালাবন্ধ ঘরটা দেখে নিয়ে বলল,—দিব্যবাবুরা চলে গেল?

—হুঁ।

পায়ে পায়ে লনে নামছিল অর্ণব, কী ভেবে ফিরল আবার। বিড়বিড় করে বলল,—কাল আমি খুব হাই হয়ে গিয়েছিলাম, না?

মালবিকার বলতে ইচ্ছে হল, শুধু হাই নয়, তুমি বড় নিষ্ঠুরও হয়ে গিয়েছিলে। একটা শব্দও ফুটল না গলায়।

অর্ণব ঝুঁকল সামান্য,—খুব আজেবাজে বকেছি, তাই না?

চোখ তুলল মালবিকা। অস্ফুটে বলল,—তুমি জানো না?

মালবিকার চোখে দৃষ্টি স্থির রেখে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অর্ণব। তারপর ঠোঁট উল্টে বলল, —মনে পড়ছে না। হোপফুলি, সিলি কিছু করিনি?

মুখে অল্প ভাঙচুর হল মালবিকার। ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল,—নাহ্।

—দ্যাটস গুড। চলো, জঙ্গলে খানিক টহল মেরে আসি।

—তুমি একাই যাও।

—ও কে। অ্যাজ ইউ উইশ।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে গেটের দিকে চলে যাচ্ছে অর্ণব। ক্রমশ দৃষ্টিসীমার বাইরে।

শুকনো মুখে বসেই আছে মালবিকা। কান্না পাচ্ছে, জল আসছে না চোখে। অর্ণবের এই ছলনার মানে কী? অর্ণব কি তাদের সম্পর্কটাকে টিকিয়ে রাখতে চায়? কালকের দিনটাকে উড়িয়ে দিচ্ছে পুরোপুরি? মালবিকার চিত্তচাঞ্চল্যকে ক্ষণিকের ভ্রম বলে ধরে নিল অর্ণব?

নাকি বিষটুকু অর্ণব রেখেই দিল? সংগোপনে। আবার হয়তো উগরে দেবে কখনও! কাল রাত্তিরের মতো!

লনের প্রান্তে বার-বি-কিউ-এর ভস্মাবশেষ। এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছে ছাই। ছড়িয়ে যাচ্ছে বনভূমিতে। মিশে গেল বাতাসে। হারিয়েও গেল।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার একটা শ্বাস পড়ল মালবিকার। নাহ্, এ যাত্রা বুঝি সম্পর্কটা টিঁকেই গেল।